pt 3-4

একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অষ্টাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

১৮৩৫ শক

কলিকাতা

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫৫, আপার চিৎপুর রোড্

সাল ১৩২০। সম্বৎ ১৯৭০। কলিগতাব্দ ৫০১৩।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অষ্টাদশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

বৈশাখ ৮৩৭ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ৮৩৮ সংখ্যা।

আষাঢ় ৮৩৯ সংখ্যা।

শ্রাবণ ৮৪০ সংখ্যা।

ভাদ্র ৮৪১ সংখ্যা।

আশ্বিন ৮৪২ সংখ্যা।

কার্ত্তিক ৮৪৩ সংখ্যা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

অষ্টাদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৪।

৮৩৭ সংখ্যা ১৮৩৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

যাচাই।

"কে নিবি গো কিনে আমায় কে নিবি গো কিনে ?"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি করে, হায়, আমার
দিন যে চলে যায়,
মাথার পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়।
কেউ বা আসে, কেউ বা হাসে, কেউ বা কেঁদে চায়।

মধ্য দিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে।
অস্ত্র হাতে মুকুট মাথে রাজা এল রথে।
বল্‌লে, হাতে ধরে', "তোমায়
কিন্‌ব আমি জোরে,"
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে'।
মুকুট মাথে ফিরল রাজা সোণার রথে চড়ে'।

রুদ্ধ দ্বারের সামনে দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি,
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।
করলে বিবেচনা, বল্‌লে
"কিন্‌ব দিয়ে সোণা,"
উজাড় করে দিয়ে থলি করলে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা।

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুলভরা গাছে,
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।
বল্লে কাছে এসে, "তোমায়
কিনব্‌ আমি হেসে,"
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে।
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বন-ছায়ার দেশে।

সাগর তীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে' বল্‌লে
"অম্‌নি নেব কিনে,"
বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেই দিনে।
খেলার মুখে বিনা মুল্যে নিল আমায় জিনে॥

আর্ব্বানা।
নিলয়। আমেরিকা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠ।

প্রশ্ন। তোমার পাথেয় দ্রব্যাদির মোট বাঁধা এখন তো হইয়াছে? তবে আর বিলম্ব কিসের? যাত্রারম্ভ করা হো'ক্। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তোমাকে আমি—সমাধি-মগ্ন অবস্থা এবং মুক্ত অবস্থার মধ্যে প্রভেদ কিরূপ? এ প্রশ্নের একটা পরিষ্কার মীমাংসা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি আর আর যতই যাহা বল না কেন তাহাতে আমার মন প্রবোধ মানিতে পারে না।

উত্তর। যাত্রারম্ভের এই মুখ্য সময়টিতে আমার যদি হিতবাক্য শোনো, তবে আমাদের-দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের নিভৃত গুহামন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার যে একটি অমোঘ মন্ত্র-বচন আছে, এই শুভ মুহূর্ত্তে সেইটি আমি তোমাকে স্মরণ করিতে বলি। সে মন্ত্র-বচনটি যে কি তাহা কাহারো অবিদিত নাই। শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহার নাম প্রণব। পাতঞ্জল দর্শনের ১ম পাদের ২৭ সূত্রে লেখে

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"

"তাঁহার (কিনা ঈশ্বরের) বাচক (কিনা পরিচয়-জ্ঞাপক সংজ্ঞা) প্রণব (কিনা ওঙ্কার)।" মা অম্বা mamma প্রভৃতি সানুনাসিক ওষ্ঠ্য বর্ণাত্মক দ্বৈমাত্রিক বা ত্রৈমাত্রিক শব্দ কচি বালকের মুখে সহজে বাহির হয় বলিয়া ঐ ধাঁচা'র শব্দগুলা যেমন স্বভাবতই মাতৃবাচক, তেমনি পরমাত্মার ধ্যানকালে ওঙ্কার-ধ্বনি ধ্যাতার মুখে সহজে বাহির হয় বলিয়া ওঁ-শব্দ স্বভাবতই ঈশ্বর-বাচক। জগৎ-সঙ্গীতের এই যে তিন শ্রেণীর গীতস্বর

(১)	(২)	(৩)
বিবাদী	বাদী	সংবাদী
ভাঙন	গড়ন	ব্যবস্থাবন্ধন
বিযোগ	উদ্যোগ	সংযোগ
প্রলয়	সৃষ্টি	স্থিতি

এই তিন শ্রেণীর গীতস্বর যেমন ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে মহত্তম আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুনাদিত করিয়া একতানে ধ্বনিত হইতেছে, তেমনি ওঙ্কারের তিনটি অক্ষর—অ উ ম—উচ্চারকের কণ্ঠকুহর হইতে ওষ্ঠাগ্র পর্য্যন্ত স্বর-নির্গমনের সমস্ত পথ অধিকার করিয়া একতানে ধ্বনিত হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ওঙ্কার-মন্ত্রের উচ্চারণ-কালে শ্রদ্ধাবান সাধকের মনে দুইসূত্রে পরমাত্মার দুইরূপ ভাব উদ্দীপিত হয়;—সৃষ্টি-প্রবণ রজোগুণ, স্থিতিপ্রবণ সত্ত্বগুণ, এবং ভঙ্গপ্রবণ তমোগুণ কারণে অন্তর্লীন রহিয়াছে—এই সূত্রে পরমাত্মার স্বরূপগত নির্গুণভাব উদ্দীপিত হয়; আর, কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতেছে, অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন দেশ-কালপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হইতেছে—এই সূত্রে পরমাত্মার সগুণ ভাব উদ্দীপিত হয়। ওঙ্কার-মন্ত্রের উচ্চারণ তাই সাধকের পক্ষে ধ্যান-কালেও যেমন, আর, সাংসারিক শুভানুষ্ঠানের পথে যাত্রারম্ভ-কালেও তেমনি, উভয়-কালেই পরম ইষ্টফলপ্রদ। অতএব শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া গন্তব্য-পথে যাত্রা-রম্ভ করা যা'ক্।

ধ্যানকালে যখন সাধক সমস্ত জগৎসংসার হইতে মন'কে উঠাইয়া লইয়া পরমাত্মার স্বরূপগত নির্গুণভাবের প্রতি লক্ষ্য স্থিরীভূত করেন, তাঁহার তখনকার সেইরূপ সমাহিত অবস্থা যোগাদি-শাস্ত্রে সমাধিনামে উক্ত হইয়া থাকে। তার সাক্ষী:—পাতঞ্জল দর্শনের ১ম পাদের ৩য় ৪র্থ সূত্রে লেখে

"তদা দ্রষ্টুঃস্বরূপে অবস্থানং।
বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র।"

"তখন (কিনা সমাধি-কালে) দ্রষ্টা-পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। অন্য সময়ে দ্রষ্টা-পুরুষ বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির সহিত জড়িত হইয়া সেই-সেই বৃত্তির রূপ ধারণ করে।"

মনোবৃত্তি প্রধানতঃ কয়প্রকার, তাহাও ঐ পাদের ৬ষ্ঠ সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে এইরূপ:—

মনোবৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার; যথা,—

"প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা স্মৃতয়ঃ।"

"প্রমাণ (কিনা সত্যজ্ঞান), বিপর্য্যয় (কিনা মিথ্যা-জ্ঞান), বিকল্প (কিনা—যেমন "সোণার পাথরবাটী" এই-রূপ শব্দমূলক অর্থশূন্য জ্ঞান), নিদ্রা, এবং স্মৃতি, এই পাঁচ প্রকার।"

তাৎপর্য্য এই যে, সমাধি-কালে আত্মার স্বরূপগত নির্গুণ ভাব দ্রষ্টা পুরুষের সমস্ত মনোবৃত্তি গ্রাস করিয়া ফ্যালে; আর-আর সময়ে, বিশেষ বিশেষ অবস্থাগতিকে দ্রষ্টা পুরুষের মনে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রাদুর্ভাব হয়;—কখনও বা সত্য জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা মিথ্যা-জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা শব্দমূলক অর্থশূন্য জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা নিদ্রার প্রাদুর্ভাব হয় কখনও বা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মাদি বিষয়ক স্মৃতির প্রাদুর্ভাব হয়।

এখন আমি তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলিতে চাই যে, দ্রষ্টা পুরুষের এই যে দুই সময়ের দুইরূপ অবস্থা—(১) সমাধিকালের স্বরূপনিষ্ঠ অবস্থা এবং (২) আর-আর সময়ের বৃত্তিনিষ্ঠ অবস্থা, এই দুই কালের দুইরূপ অবস্থা ছাড়া—দ্রষ্টা পুরুষের সর্ব্বকালের আর একরূপ অবস্থা আছে, যাহাকে বলা যাইতে পারে—আত্মার বন্ধনশূন্য স্বাভাবিক অবস্থা বা সিদ্ধাবস্থা; আর, গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মগতভাব এবং তাৎপর্য্যের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিয়া আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে তাহারই নাম মুক্ত অবস্থা।

প্রশ্ন। একটি কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি:— সংসার-ধর্ম্ম ভাল, না সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ভাল? আমি সোজাসুজি বুঝি এই যে, এরূপ যদি হয় যে, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অপেক্ষা সংসার-ধর্ম্ম ভাল, তবে সব কাজ ছাড়িয়া সর্ব্বকালেই গার্হস্থ্য এবং সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাকা সাধকের পক্ষে শ্রেয়; পক্ষান্তরে যদি এরূপ হয় যে, সংসার-ধর্ম্ম অপেক্ষা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ভাল, তবে সব ছাড়িয়া সর্ব্বকালেই যোগসাধনে নিযুক্ত থাকা সাধকের পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু এটা যখন স্থির যে, সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধনে অষ্টপ্রহর ব্যাপৃত থাকিলে ত্রিগুণের বন্ধন এড়ানো যাইতে পারে না, আর, এটাও যখন স্থির যে, যোগ-সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধক ত্রিগুণের বন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন, তখন এ কথা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে সাংসারিক কর্ত্তব্য-সাধনের পথ বন্ধনের পথ বই মুক্তির পথ নহে—যোগ-সাধনের পথই মুক্তির পথ। আমি তাই বলি এই যে, যাঁহারা সংসারের সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি দিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা সব সময়েই সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাদের মতো সিদ্ধপুরুষদিগের আটপহরিয়া তুরীয় অবস্থাকেই মুক্ত অবস্থা বলা সঙ্গত।

উত্তর॥ কেহ যদি তোমাকে বলেন—"কর্ম্ম ভাল—না বিশ্রাম ভাল?" আর, তাহার পরে যদি বলেন—

"যদি এমন বোঝো যে, বিশ্রাম অপেক্ষা কর্ম্ম ভাল, তবে বিশ্রামে জলাঞ্জলি দিয়া রাত্রি দিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা অনবরত পূর্ণ উদ্যমের সহিত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা তোমার খুব উচিত; পক্ষান্তরে যদি এমন বোঝো যে, কর্ম্ম অপেক্ষা বিশ্রাম ভাল, তবে সবকর্ম্ম ফেলিয়া রাত্রি দিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা সর্ব্বক্ষণই হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা, অথবা যাহা আরো ভাল—হাত পা ছড়াইয়া নিদ্রা দেওয়া তোমার অত্যন্ত উচিত;" তবে তাঁহার সে কথার তুমি কী উত্তর দিবে জানি না, কিন্তু আমাকে যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি তাঁহাকে বলিব এই যে, রাত্রিকালে সুনিদ্রা না হইলে দিবসের কার্য্যে কাহারো রীতিমত উদ্যমের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না; আবার দিবসের কার্য্যে যথাবিহিত যত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত শক্তি খাটানো না হইলে রাত্রিকালে কাহারো সুনিদ্রা হইতে পারে না। কর্ম্মের সময় কর্ম্ম এবং বিশ্রামের সময় বিশ্রাম করিলে কর্ম্মও ভাল হয়—বিশ্রামও ভাল হয়; তাহার অন্যথাচরণ করিলে কর্ম্মও ভাল হয় না—বিশ্রামও ভাল হয় না। আবার, ক্রিয়াশক্তির পূর্ণোদ্যম এবং পূর্ণাবসানের মাঝের সোপানের প্রধান দুইটি ধাপ অর্দ্ধোদ্যম এবং অর্দ্ধাবসান;—সে দুইটি ধাপ না মাড়াইয়া পূর্ণোদ্যম হইতে পূর্ণাবসানে নামিতে পারা কাহারো পক্ষে সম্ভবসাধ্য নহে। কোন্ ধাপে কখন্ পদনিক্ষেপ করিতে হইবে—প্রকৃতি মাতার সৌর ঘটিকার শব্দহীন ভাষায় তাহার সময়ও ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে অতি সুন্দর প্রণালীতে। জীবজগতে তাই একথা দেশময় রাষ্ট্র—যে ক্রিয়াশক্তির পূর্ণোদ্যমের মুখ্য সময়—পূর্ব্বাহ্ণ, অর্দ্ধোদ্যমের মুখ্য সময় অপরাহ্ণ, অর্দ্ধাবসানের মুখ্য সময় সায়াহ্ণ, পূর্ণাবসানের মুখ্য সময় রাত্রিকাল। বলা বাহুল্য যে, সময়ে আহার, সময়ে ক্রীড়াকৌতুক, সময়ে নিদ্রা, সময়ে জাগরণ পরস্পরের পথে পুষ্প নিক্ষেপ করে, আর, অসময়ে আহার, অসময়ে ক্রীড়াকৌতুক, অসময়ে কর্ম্মচেষ্টা অসময়ে নিদ্রা, অসময়ে জাগরণ পরস্পরের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে। গীতাশাস্ত্রে লেখেও তাই; যথা:—

"যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

ঠিক্ সময়ে ঠিক্মতো আহার বিহার, ঠিক্ সময়ে ঠিক্মতো কর্ম্ম চেষ্টা, ঠিক্ সময়ে ঠিক্মতো সুপ্তি-জাগরণ, দুঃখনাশক যোগের অব্যর্থ সোপান।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে আমি তাই তিনটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।

প্রথম স্মর্ত্তব্য।

যেমন রাত্রিকালে ভাল করিয়া নিদ্রা না হইলে দিবসের কার্য্যে কাহারো রীতিমতো উদ্যমের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, তেমনি ধ্যানকালে সাধকের মন মোটজ্ঞানের মোট সত্যে নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় স্থিরীভূত না হইলে কার্য্যকালে তাঁহার মন ভরপুর উদ্যমের সহিত মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় স্মর্ত্তব্য।

যেমন দিবসের কার্য্য যথোচিত প্রযত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত সুনির্ব্বাহিত না হইলে, রাত্রিকালে কাহারো সুনিদ্রা হইতে পারে না, তেমনি কার্য্যকালে সাধকের মন রীতিমত উদ্যমের সহিত মঙ্গলের পথে পরিচালিত না হইলে, ধ্যানকালে তাঁহার মন পরম সত্য পরমাত্মাতে স্থিরীভূত হইতে পারে না।

তৃতীয় স্মর্ত্তব্য।

ধ্যানকালে সাধকের চিত্ত পরম সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, কার্য্যকালে পরম মঙ্গলের পথে সহজেই তাঁহার মতিগতি হয়। তেমনি আবার কার্য্যকালে সাধক কায়মনোবাক্যে মঙ্গলের পথে লাগিয়া থাকিলে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, আর গীতার একথাটি বড়ই ঠিক্ যে,—

"প্রসন্ন-চেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।"

প্রসন্ন-চেতার বুদ্ধি পরম সত্যে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

তোমার এই যে প্রশ্ন—যে, যোগ-সাধন যদি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর হয়, তবে সব ছাড়িয়া সাধক সমস্ত

জীবন রাত্রিদিন যোগসাধনে নিযুক্ত না থাকেন কেন, আর যদি সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর হয়, তবে সব ছাড়িয়া সাধক সমস্ত জীবন দিবারাত্রি সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত না থাকেন কেন? তোমার এ প্রশ্নের সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায় খুবই স্পষ্ট; তাহা এই যে, যাহাকে বলা যায়—সাংখ্যানুমোদিত যোগ-সাধন, তাহা জ্ঞানযোগের সাধন; আর, যাহাকে বলা যায় ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যসাধন, তাহা কর্ম্মযোগের সাধন; দুই-ই যোগ-সাধন, আর, দুইই ইষ্টফলপ্রদ। তা ছাড়া, গীতাশাস্ত্রের মতে ভজনও একপ্রকার সাধন—ভক্তি-যোগের সাধন। ফলে, শিবের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে যেমন যজ্ঞ নিষ্ফল হয়, তেমনি ভক্তিযোগের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে জ্ঞানযোগই বা কি, আর কর্ম্মযোগই বা কি দুইই নিষ্ফল হয়। এ সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের সার উপদেশ তিনটি:—

প্রথম উপদেশ।

পরাৎপর পরম সত্য পরমাত্মাতে বুদ্ধির যোগ-সাধন করিবে। ইহাই জ্ঞানযোগের উপদেশ।

দ্বিতীয় উপদেশ।

ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যের পথে মনের যোগ-সাধন করিবে। ইহাই কর্ম্মযোগের উপদেশ।

তৃতীয় উপদেশ।

সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরেতে প্রীতি স্থাপন করিবে। ইহাই ভক্তিযোগের উপদেশ।

ভক্তিযোগের এই উপদেশটি আবার যে কেবল গীতা-শাস্ত্রেরই উপদেশ তাহা নহে, উহা সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রেরই প্রধানতম উপদেশ। তার সাক্ষী:—বাইবেলের নব-বিধানের একস্থানে এইরূপ লেখে যে, ইহুদীদিগের এক-জন ধর্ম্মশাস্ত্রী যখন ঈশা-মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "Which is the great commandment in the law?" "ধর্ম্মশাস্ত্রের সেরা উপদেশ কোন্‌টা? ঈশা তাহার উত্তর দিলেন এই যে, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment" "তোমার পরম প্রভু পরমেশ্বরকে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি করিবে—ইহাই প্রথম এবং প্রধান উপদেশ।"

পাতঞ্জল-দর্শনের ভোজরাজ কৃত টীকায় "ঈশ্বর প্রণি-ধানাদ্ বা" এই সূত্রের অর্থ করা হইয়াছে এইরূপ;—:

"ঈশ্বর-প্রণিধানং—তত্র ভক্তিবিশেষঃ, বিশিষ্টং উপা-সনং; সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং—বিষয়সুখাদিকং ফলং অনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া তস্মিন্ গুরৌ অর্পয়তীতি। তৎ-প্রণিধানং সমাধেঃ তৎফলস্য চ প্রকৃষ্ট উপায়ঃ।"

ইহার অর্থ:—

"ঈশ্বর প্রণিধান কি? না ঈশ্বরেতে ভক্তি বিশেষ—বিশিষ্ট রকমের উপাসনা—বিষয়সুখাদি ফলের প্রত্যাশা না রাখিয়া পরমগুরু পরমেশ্বরেতে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ। এইরূপ যে ঈশ্বর প্রণিধান, ইহাই সমাধি এবং তাহার ফললাভের প্রকৃষ্ট উপায়।"

শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত সর্ব্ববেদান্তের সারসংগ্রহে আছে—

"অত্যন্তং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা গুরুমীশ্বরমাত্মনি।
যো ভজত্য নিশং শান্তঃ তস্য চিত্তং প্রসীদতি॥
*　　*　　*　　*
"মনোঽপ্রসাদঃ পুরুষস্যবন্ধো মনঃ প্রসাদো।
ভববন্ধমুক্তিঃ॥"

ইহার অর্থ:—

"অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যিনি পরমগুরু পর-মেশ্বরকে শান্তচিত্তে ভজনা করেন, তাঁহার মন প্রসন্ন হয়। * * * * মনের অপ্রসন্নতাই পুরুষের বন্ধন; মনের প্রসন্নতাই সংসারবন্ধনের মুক্তি।"

সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রেরই মতে ভজন এবং সাধনের মধ্যে এইরূপ যখন হরিহরাত্মা সম্বন্ধ, তখন ন্যায্য বিধানমতে সাধকের উচিত ভক্ত হওয়া—ভক্তের উচিত সাধক হওয়া। কিন্তু দুঃখের কথা কি আর বলিব; আমাদের দেশের মাটির গুণেই হোক, আর গ্রহবৈগুণ্যেই হোক—ঘটনা-ক্রমে হইয়া দাঁড়াইয়াছে দোঁহার মধ্যে এক প্রকার সর্প-নকুলের সম্বন্ধ। ভক্তিশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী নামজপাদি যদি চ সাধনেরই অঙ্গ, তথাপি তাহা ভজন-প্রধান তাহাতে আর ভুল নাই; তেমনি আবার, যোগশাস্ত্রের বিধা-নানুযায়ী ঈশ্বরেতে কর্ম্মসমর্পণ যদি চ ভজনেরই অঙ্গ, তথাপি তাহা সাধনপ্রধান তাহা দেখিতেই পাওয়া যাই-তেছে। এইজন্য আমাদের দেশের লোকসমাজে বৈষ্ণব শ্রেণীর সাধুরাই বিশিষ্টরূপে ভক্ত বলিয়া পরিচিত; আর, যোগিতপস্বীরাই বিশিষ্টরূপে সাধক বলিয়া পরি-চিত; এই রকম করিয়াই আমাদের দেশের পরমার্থপথের যাত্রীগণেরা ভক্ত এবং সাধক নামধারী দুই পৃথক্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন; আর, সেই সূত্রে কালক্রমে উভয়ের মধ্যে এরূপ একটা আড়া-আড়ি ভাবের সম্বন্ধ ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এ সম্প্রদায়ের পথ-যাত্রীরা যদি যা'ন উত্তর মুখে, ও-সম্প্রদায়ের পথযাত্রীরা তবে যা'ন দক্ষিণ মুখে। এরূপ স্থলে মুক্তি-সম্বন্ধে যে, উভয়ের মধ্যে মতবৈষম্য হইবে না—তাহার বড় একটা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহা দূরে থাকুক্—উল্টা আরো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধক-সম্প্রদায়ের যোগীতপস্বীরা মুক্তি বলিতে বোঝেন—সাংখ্য-দর্শনে যাহাকে বলে কৈবল্য; আর ভক্তসম্প্রদায়ের সাধুরা

মুক্তি বলিতে বোঝেন—ভক্তিশাস্ত্রে যাহাকে বলে সালোক্য সামীপ্য অথবা সাযুজ্য। "সালোক্য" অর্থাৎ যেমন বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি; "সামীপ্য" অর্থাৎ যেমন চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার প্রাপ্তি; "সাযুজ্য" অর্থাৎ নারায়ণের মধ্যে যেরূপ একাত্মভাব পুরাণে শুনা যায়—ভগবান্ এবং ভক্তের মধ্যে সেইরূপ ঘনিষ্ঠ একাত্মভাব। এই যে দুই বিরোধী সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী দুই বিরোধী শ্রেণীর মুক্তি—দুয়ের কোনটিই গীতাশাস্ত্রের অভিমত বলিয়া আমার বোধ হয় না এইজন্য—যেহেতু আমার এইরূপ ধারণা যে, সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে কোনো দেশের কোনো শাস্ত্র যদি অসাম্প্রদায়িক নামের যোগ্য হয়, তবে সে শাস্ত্র আমাদের দেশের গীতাশাস্ত্র। সাংখ্যদর্শনের কৈবল্যপ্রাপ্ত কেবলাত্মা জ্ঞানবর্জ্জিত প্রেমবর্জ্জিত গুণবর্জ্জিত ক্রিয়াবর্জ্জিত—সর্ব্ববর্জ্জিত; সুতরাং "কিছুই না" বলিয়া যদি কোনো পদার্থ থাকে, তবে সাংখ্যাভিমত কেবলাত্মা তাহারই আর এক নাম। সাংখ্যচিকিৎসকের মুক্তি-প্রণালীই এইরূপ :—

যাহাকে তুমি বলিতেছ নীরোগ শরীর, তাহার মধ্যেও কিছু-না-কিছু রোগের সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব যে ব্যক্তি একান্ত পক্ষেই রোগমুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহার উচিত—উৎকট বিষপান করা; তাহা হইলে তাহার প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর হইতে সমস্ত আধিব্যাধি সমূলে উন্মূলিত হইয়া যাইবে। আত্মা হইতে আত্মার সত্তা এবং তাহার সংশ্রিত জ্ঞান এবং আনন্দ উন্মূলিত করা হইলেই, সেই সঙ্গে আত্মা হইতে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা উন্মূলিত হইয়া যাইবে; ইহা ব্যতীত ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির দ্বিতীয় উপায় নাই।

বেদান্ত চিকিৎসকের মুক্তিপ্রণালী অন্য প্রকার। তাহা এইরূপ : –

যদি রোগমুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে বিধিমতে ঔষধ পথ্য সেবন করিয়া রোগকে শরীর হইতে দূর করিয়া দেও, তাহা হইলেই রোগের পরিত্যক্ত স্থান আরোগ্যে ভরাট হইয়া যাইবে। অবিদ্যার ঘন কুহেলিকা আত্মা হইতে নিঃশেষে সরিয়া গেলে অবিদ্যার পরিত্যক্ত স্থান ব্রহ্মানন্দে ভরাট হইয়া যাইবে। বেদান্তসম্মত মুক্তির সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা যাহা আমার বক্তব্য আছে, তাহা পরে হইবে—এখন থাক্। সাধক সম্প্রদায়ের অভিলাষানুরূপ কৈবল্য মুক্তিতে কেন আমার মন সায় দ্যায় না তাহা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি; ভক্তসম্প্রদায়ের অভিলাষানুরূপ সালোক্যাদি সংজ্ঞক মুক্তিতেও আর এক কারণে আমার মন সায় দ্যায় না। সে কারণ এই যে, কচি বালকেরা যেমন পুতুল-খ্যালা লইয়া ভুলিয়া থাকে, সালোক্যাদির অনুপন্থীরা তেমনি ঈশ্বরের নানাপ্রকার মূর্ত্তি-কল্পনা লইয়া ভুলিয়া থাকেন, তা বই, সত্যাসত্যের অনুসন্ধানে যে কোনো প্রয়োজন আছে, তাহা তাঁহারা মনে করেন না।

প্রশ্ন॥ গীতাশাস্ত্রের মতানুযায়ী মুক্ত পুরুষের লক্ষণ তুমি তবে কী ঠাওরাও?

উত্তর॥ ধ্যানকালে যাঁহার চিত্ত ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরম সত্যে সহজেই সমাহিত হয়; কার্য্যকালে যাঁহার মন নিষ্কাম এবং অনাসক্তভাবে মঙ্গলের পথে সহজেই পরিচালিত হয়, এবং সর্ব্বকালে ঈশ্বরপ্রেমে যাঁহার মন পরমানন্দে আনন্দিত—গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায়মতে তিনিই মুক্তপুরুষ।

প্রশ্ন॥ কিন্তু গীতাশাস্ত্রের পুঁথি খুলিয়া তোমাকে আমি দেখাইতে পারি যে, ত্রিগুণাতীত নিঃসঙ্গ কেবলাবস্থাই গীতাশাস্ত্রোক্ত মুক্ত পুরুষের একটি প্রধান পরিচয় লক্ষণ; আর, এটাও তোমাকে আমি দেখাইতে পারি যে, গীতাশাস্ত্রের ১১শ অধ্যায়ে ভগবানের দুইরূপ মূর্ত্তির অবতারণা করা হইয়াছে—একটির পরে আর একটি। প্রথমটি সহস্র-মুখচক্ষুমস্তক সহস্রবাহু, সহস্রপদ ভীষণ বিরাট মূর্ত্তি; দ্বিতীয়টি স্নিগ্ধ মনোহর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি। অতএব তুমি যাহাকে বলিতেছ শূন্যাত্মবাদদূষিত কৈবল্যসংজ্ঞক মুক্তি তাহাও গীতাশাস্ত্রের মতবিরুদ্ধ নহে, আর, তুমি যাহাকে বলিতেছ ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনা-দূষিত সালোক্যাদিসংজ্ঞক মুক্তি তাহাও গীতাশাস্ত্রের মতবিরুদ্ধ নহে।

উত্তর॥ কোনো একটি কাব্যগ্রন্থের নায়িকাকে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা বলা হইয়াছে দেখিয়া তুমি যদি গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এইরূপ বোঝো যে, সুন্দরী কন্যাটির মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় চক্রাকৃতি, তবে তোমার সেই মার্জ্জিত বুদ্ধির সিদ্ধান্তটি কোনো সূত্রে গ্রন্থকারের কর্ণগোচর হইলে যে ভাবে তিনি মনে মনে হাস্য করিবেন তাহা আর বলিবার কথা নহে; তেমনি, গীতাশাস্ত্রে মুক্ত পুরুষকে নিঃসঙ্গ এবং গুণাতীত বলা হইয়াছে দেখিয়া তুমি যদি শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় এইরূপ বোঝো যে, মুক্ত পুরুষ জ্ঞানবর্জ্জিত প্রেমবর্জ্জিত সর্ব্ববর্জ্জিত কিছুই-না'র আর এক নাম; অথবা, গীতাশাস্ত্রে ভগবানের অদ্ভুত প্রকার বিভূতি বর্ণনা দেখিয়া শাস্ত্রকারের মর্ম্মগত অভিপ্রায় তুমি যদি এরূপ বোঝো যে, ঈশ্বর সত্যসত্যই সহস্র মস্তক, সহস্র বাহু, এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদিগের ন্যায় করাল দংষ্ট্রায়ুধবিশিষ্ট; অথবা গীতাশাস্ত্রে ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির উল্লেখ দেখিয়া শাস্ত্রকারের মর্ম্মগত অভিপ্রায় তুমি যদি এইরূপ বোঝো যে, পশুরা যেমন সত্যসত্যই চতুষ্পদ, জগৎপাতা ভগবান্ তেমনি সত্যসত্যই চতুর্ভুজ, তবে তোমার সেই চমৎকার বুদ্ধির সিদ্ধান্তটি কোনো গতিকে শাস্ত্রকারের কর্ণগোচর হইলে, তিনিও

সেইভাবে মনে মনে হাস্য করিবেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু সে যে হাস্য কী ভাবের হাস্য—পরম সন্তোষের হাস্য অথবা অধম অবজ্ঞার হাস্য, সে কথা না-তোলাই তোমার পক্ষে ভাল—কেন না লোকসমাজে তুমি একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত।

প্রশ্ন॥ তোমার ও সকল ছেঁদো কথায় আমি ভুলি না। গীতাশাস্ত্রের ঐ ঐ স্থলে শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় সকলেই যাহা বোঝে, আমিও তাহাই বুঝি; তদ্ব্যতীত, তাহার ভিতরে নূতন-ধাঁচার আর-যদি-কোনোরকম বুঝিবার বস্তু থাকে, তবে আমার তাহা স্বপ্নের অগোচর। গীতাশাস্ত্রের ঐ সকল স্থলে শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় তোমার অ্যাক্‌লার বুদ্ধিতে না জানি তুমি কিরূপ বুঝিয়াছ, সেইটি কেবল জানিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; অতএব আর আর কথা ছাড়িয়া সেই কথাটি আমাকে খুলিয়া খালিয়া বলো।

উত্তর॥ আমার যাহা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা আমি আমার অ্যাক্‌লার বুদ্ধিতেই বুঝিয়া থাকি, আর, দশ জনের বুদ্ধিতেই বুঝিয়া থাকি, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না;—তাহা যদি যুক্তিগর্ভ হয়, তবে সকলের বুদ্ধিতেই তাহা ক্রোড় পাতিয়া সাদরে গৃহীতব্য; পক্ষান্তরে, তাহা যদি অযৌক্তিক হয়, তবে কাহারো বুদ্ধিতে তাহা তিলমাত্রও স্থান পাইবার যোগ্য নহে। তা ছাড়া, তুমি চাহিতেছ কেবল তোমার কৌতূহলের চরিতার্থতা; কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে, তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টির একটা পরিষ্কার মীমাংসা হইলে অনেকের অনেক প্রকার মনের ধন্দ ঘুচিয়া যায়; আর, সেইজন্য তোমার ঐ প্রশ্নটির সদুত্তর প্রদান করা খুবই আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা তাড়াহুড়ার কর্ম্ম নহে—আগামী বারের অধিবেশনে ধীরেসুস্থে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তীর্থ যাত্রা।

মহাত্মা কবীরকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে ব্রহ্ম কি অরূপ না সরূপ। তিনি এক না দুই? তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে "তাঁহাকে যদি বলা যায় যে তিনি কেবলমাত্র অরূপ তাহা হইলেও মিথ্যা হয়—আর যদি বলা যায় যে তিনি বিশেষ কোন রূপ তাহা হইলেও মিথ্যা হয়। তিনি সর্ব্বরূপেই আছেন—কারণ তিনি আছেন বলিয়াই তো রূপ আছে। তাঁহাকে ছাড়া যে একটি পরমাণুরও এক নিমেষের স্থিতি নাই। অথচ তিনি সর্ব্বরূপে আছেন বলিয়াই তো তিনি বিশেষ কোন রূপের অতীত। আবার তিনি সর্ব্বরূপের সমষ্টি মাত্রও নন্—তাহারও অতীত, সেই হিসাবে তিনি অরূপ। এক হিসাবে আমরা তাঁহাকেই প্রতিমুহূর্ত্তে ধরিতেছি, ছুঁইতেছি; তাঁহারই নীচে, তাঁহারই উপরে, চলিতেছি ফিরিতেছি—আবার অন্যদিকে তিনি আমাদের সকল পরশ সকল বোধের অতীত, অনন্ত। একই কালে তিনি উভয় স্বরূপ। কাজেই তাঁহাকে কেবলমাত্র অরূপ বা সরূপ বলিলে ভ্রম করা হয়। তিনি যদি সর্ব্ববিধ বন্ধনের অতীত হন তবে রূপই বল আর অরূপই বল কোন বন্ধনেই ধরা দিবেন না। এইজন্য তিনি অনন্ত অরূপ হইয়াও প্রত্যেক রূপেই বিদ্যমান এবং প্রতিরূপে বর্ত্তমান হইয়াও অরূপ।"

"আর তিনি যদি সর্ব্ববিধ বন্ধনেরই অতীত হইলেন তবে কি তিনি কেবলমাত্র সংখ্যার বন্ধনেই আবদ্ধ হইয়া গেলেন! তিনি এক না দুই! তিনি একও নহেন দুইও নহেন—তিনি সংখ্যার অতীত। এই ভুল করে বলিয়াই কেহ বলে তিনি এক, কেহ বলে দুই, কেহ বলে এক হইলেও দুই, কেহ বলে দুই হইলেও এক, ইত্যাদি। আসল কথা তিনি সর্ব্ববিধ বন্ধন ছাড়াইয়া শেষে কি সংখ্যার গারদে পড়িবেন?" এইজন্য কবীর বলিলেন,—

আগে অনেক বিচার ভৌ রূপ অরূপ তহি কুছ নাহী।
বহুত ধ্যান ধরি দেখিয়া নহি ত্যহি সংখ্যা আহী॥

"অর্থাৎ পূর্ব্বে অনেক বিচার তর্ক হইয়াছে,—দেখা গিয়াছে যে রূপ বা অরূপ তাঁহাতে কিছুই নাই। আর বহুত ধ্যান ধরিয়া দেখিলাম যে তাঁহাতে কোনো সংখ্যা নাই।" ব্রহ্ম যে একই কালে অসীম ও সসীম এ কথা ভারতে তো নূতন নহে। তিনিই "অনন্তম্ ব্রহ্ম," আবার "আনন্দরূপম্" হইয়া তিনিই "অগ্নৌ, অপ্সু, বিশ্বভুবনমাবিবেশ।"

উপনিষদে এই তত্ত্ব নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মের এই যে অপার বৈচিত্র্য ইহা বিশেষ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে বৈষ্ণব সাধনায়। বৈষ্ণব সাধকগণ দেখিয়াছেন যে এক দিকে তিনি অচ্যুত পরিপূর্ণ অনাদ্যনন্ত বিষ্ণু। তাঁহা হইতেই জন্ম, তাঁহাতেই স্থিতি ও লয়। আবার তিনি নারায়ণ হইয়া সকল নরের সাথে সাথে যাত্রা করিয়াছেন। ভক্তের সাধনার বিচিত্রতায় তিনিও বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইতেছেন। আমার হৃদয়ের স্বামী তোমার হৃদয়ের স্বামী নহেন। এক এক দেশের সাধ-

নার নিকট তাঁহার এক এক বিশেষ রূপ। নারায়ণ-রূপে তাঁহাতে বিচিত্রতার আর অন্ত নাই।

এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেন বলিয়াই, বৈষ্ণব সাধকদের কৃপায় ভারতীয় সাধনা নানাবিধ বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তার মধ্যে একটি সাধনা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য—তাহা তীর্থ যাত্রা। উপনিষদের সাধকেরাও নানা আশ্রমে নানা আচার্য্যের সাধনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—কিন্তু বৈষ্ণবের তীর্থ যাত্রার বৈচিত্র্যরস তাহাতে নাই বলিয়া তাঁহাদের তীর্থ যাত্রা বৈষ্ণবদের ন্যায় গভীর ও ব্যাপক হয় নাই।

নানা সাধক মণ্ডলীর নানা সাধনায় নারায়ণের নানাবিধ রস ও সৌন্দর্য্য হয় বলিয়া নানা সাধনতীর্থে নারায়ণের নানা মূর্ত্তি। দ্বারকায় তাঁহার যে রূপ, বদরিকায় তাহা নহে—পুরুষোত্তমের রূপ বৃন্দাবনে দুর্লভ, এবং বৃন্দাবনের রূপই বা আর কোথায় মেলে? এই যে বৈচিত্র্য ইহাকে তো তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেনই, তার উপরে ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে—এই বৈচিত্র্যই অমৃত। বৈচিত্র্যই প্রত্যেক সাধনা প্রত্যেক সাধনাক্ষেত্রও প্রত্যেক সাধককে অমৃতত্ব দান করিয়াছে। রবিদাস বলিয়াছেন,—

"বইচিত্র সাধনকে অমৃত হৈ বইচিত্র সাধক মাহিঁ।
বইচিত্র মন্দিরকে অমৃত হৈ সাঈঁ বইচিত্র অবগাহী॥"

"বৈচিত্র্যই সাধনার অমৃত, সাধকেরও অমৃত বৈচিত্র্য, মন্দির অর্থাৎ তীর্থেরও অমৃত বৈচিত্র্য, কারণ যিনি স্বামী তিনি বৈচিত্র্যের অমৃতেই অবগাহন করেন।"

বৈচিত্র্য অমৃত কেন এই কথাটা একবার বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। আমি যে তোমা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ আমার যে ন্যায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ, বা আর কিছুই নাই ইহাতেই আমার অমৃত। ব্রহ্ম আপনার আনন্দকেই নানা ব্যক্তি ও নানা রূপের মধ্যে বিচিত্র করিয়া সম্ভোগ করিতে চাহেন। তিনি যদি বৈচিত্র্যপিপাসু হন্ তবে আমার মধ্যে যে একটি স্বতন্ত্র বিচিত্রতা আছে তাহাতেই আমার রক্ষা। আমি যদি ধ্বংশপ্রাপ্ত হই তবে তিনি যে উপবাসী থাকিবেন—অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সংহারিণী শক্তির সমবেত চেষ্টাও আমাকে লুপ্ত করিতে পারে না। পাপে যখন এই হৃদয় মলিন, এই আত্মা কলুষিত, সকল মানব যখন আমাকে ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে, তখনও তিনি আমার সাথে সাথে আছেন। প্রতিদিন সজল নেত্রের অনুনয় লইয়া, সবেদন বাঁশরীর সঙ্গীত আমার হৃদয়পুরে শ্রবণ করাইয়া, সপুলক পরশে আমাকে সচেতন করার প্রয়াস লইয়া, আমার সাথে সাথে সেই আমার হৃদয়-কমলের বিচিত্ররসপিয়াসী রসিকবর আছেন। তিনি যে আমার চিত্তকমলের রস চাহেন। আমার হৃদয়-কমলের যে রস তাহা তো আর কোথাও নাই। তাই সকলে আমার আশা ছাড়িলেও তিনি তো আশা ছাড়িতে পারেন নাই। তাই তিনিও আমার সাথে নানা দুঃখ নানা বন্ধন স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। তাই বাউলরা গাহিয়াছেন—

"হৃদয়-কমল চলছে গো ফুটে
কত যুগ ধরি
তাতে আমিও বান্ধা তুমিও বান্ধা
আমি উপায় কি করি!
ফোটে ফোটে ফোটে কমল ফোটার না হয় শেষ
এই কমলের যে এক মধু রস যে তার বিশেষ।
আমায় ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পার না যে তাই
ওগো তুমিও বান্ধা আমিও বান্ধা মুক্তি কোথাও নাই।
পার যদি যাও না ছেড়ে,
তুমি ছাড়বে কি করি।"

এই যে আমার বিশেষত্ব, ইহাই আমার অমৃতত্ব। আমার ন্যায় আর যদি কেহ বা কিছু থাকিত তবে আমাকে বাদ দিলেও রসলীলার কোন ক্ষতি হইত না; কিন্তু তা যে নাই। তাই তো উপনিষদের সাধক বলিয়াছেন—"আত্মানং বিদ্ধি।" যে আত্মাকে জানিয়াছে সে "অমৃতত্বমেতি" সে অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে যে অমৃত সেই সম্বাদ জানে।

এই তত্ত্ব যেই মুহূর্ত্তে সাধকের উপলব্ধ হয় সেই মুহূর্ত্তেই সাধকের যুগপৎ মহানন্দ ও মহা বেদনা। আনন্দ, আমি অমর। বেদনা, যে তিনি প্রতিদিন আমার অন্তরদ্বারে উপবাসী হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। তাই "ইয়ম্ শ্রবণ মাতলো" সঙ্গীতে বড় দুঃখে জ্ঞানদাস গাহিয়াছেন:—

"এ কথা যে দিন শুনিলাম সেই দিনই তো আমি পাগল হইয়া গেলাম। হে রাজরাজ, কোন্ প্রেমে তুমি এই দীনের কুঞ্জদ্বারে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া? এক কপর্দ্দক মূল্য নাই যার, সেই হৃদয় যে তোমার চরণ-পরশে অসীম মূল্য প্রাপ্ত হইল! হে বিভবধাম রাজরাজ, এই কাঙ্গালের কাছে তোমার কি প্রার্থনীয় হইতে পারে; এই কাঙ্গালের কাছে তুমি কেন প্রার্থনা কর?"

তখন তিনি উত্তর দিতেছেন, "আমি তো আপনিই তোমাকে কাঙ্গাল করিয়াছি, কারণ কাঙ্গালটিকেই যে আমি চাই।" * তিনি আবার বলিতেছেন, "হে প্রিয়, আমার সমগ্র বিশ্বধাম তোমাকে ছাড়া-ব্যর্থ, সেই জন্য

* তোমার যদি কিছু সম্পদ থাকিত তবে হয় ত তাহা দিয়াই আমাকে ফিরাইয়া দিতে। এখন তুমি রিক্ত—আমার আপন হাতে করা অকিঞ্চন কাঙ্গাল, এখন যে তোমার কাছে আমি হাত পাতিলাম, এখন নিজেকে দেওয়া ছাড়া আর তোমার অন্য গতি নাই।

আমি অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া তোমাকে চাহিতেছি।" তখন ভক্ত বলিয়া উঠিতেছেন, "ওরে প্রাণ, ওরে দীন, আজ খুলিতেই হইবে তোর দ্বার, কতকাল আর তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিবি দ্বারের বাহিরে। হৃদয়ের বেদনা দূর করিয়া আজ নিজের সফলতা সাধন করিয়া নে। যুগ যুগ প্রতীক্ষা করিতেছেন স্বামী, শুদ্ধ তাঁহার মূর্ত্তি, শুদ্ধ তাঁর বাণী।" জ্ঞানদাস বলেন:—"হে সখি, আজ বাহির হইয়া এই ক্ষণকে মিলনের লগ্ন করিয়া তোল।"

এইজন্য অমৃতত্বের বোধের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বেদনার তত্ত্ব ;তাই "অহম্ অমৃতের" বোধের সঙ্গে সাধকের "জরনাকো অঙ্গ" অর্থাৎ "জ্বলিয়া যাইবার পালা" আসে।

"সোই সেবক সব জরই, জেতা রস পীয়া" (দাদু, জরনাকো অঙ্গ, ১০)—"তাঁর সকল সেবক মরিতেছে জ্বলিয়া, যে যে করিল তাঁহার অমৃতরস পান।" তখন পরিপূর্ণ মিলন ছাড়া আর জুড়াইবার কোন উপায় নাই। যাহা হউক এই বিশেষত্ব এই বৈচিত্র্যই আমাদের পরম আশার ভূমি। "আমাকে পাপতাপ কিছুতেই পরাভূত করিতে পারিবে না, আমি সকলের উপর জয়ী হইবই," এই তত্ত্ব ইহাতে উদ্বোধিত। কারণ ব্রহ্মের যেখানে রসলীলা হইবে তাহাকে আচ্ছন্ন করে কে? তাহার পরাভব কয় দিনের?

সাধনার মধ্যে যে বৈচিত্র্য তাহাতে সাধনা অমর। তীর্থের মধ্যে যে বৈচিত্র্য তাহাতে তীর্থ অমর।

এখন সাধকের চেষ্টা যদি হয় সাধ্য দেবতাকে তৃপ্ত করা, তবে তাঁর অভিষেককেও সর্ব্ব বৈচিত্র্য দান করিতে হইবে। এই জন্য বৈষ্ণব সাধক যখন তাঁহার মুখ্যতীর্থে কাম্য দেবতার কাছে দীক্ষা লয়েন তখন যদি তিনি কেবল সেই তীর্থেরই বারি লইয়া সেই দেবতার অভিষেক করেন, তবে তাহা "সামান্যাভিষেক।" আর যদি সকল তীর্থের জল লইয়া তাঁহার দেবতাকে অভিষেক করাইতে পারেন, তবে তাহা "মহাভিষেক।"

এই ভারতের সাধকগণ কাম্য তীর্থে কাম্য দেবতার চরণতলে বীজ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া স্কন্ধে তীর্থ যাত্রীর বাঁশের ঝাঁপীর বাঁক দোলাইয়া সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমণে বাহির হয়। সম্মুখের ঝাঁপিতে থাকে কাম্য দেবতার অভিষেকামৃত। আর পশ্চাতের ঝোলায় তার লোটা কম্বল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এক এক তীর্থ যায় আর সেই সেই তীর্থের চরণামৃত লইয়া তার তীর্থ সলিল পাত্রে রাখে—সর্ব্ব তীর্থ ঘুরিয়া আসিয়া সর্ব্বতীর্থোদকে পরম দেবতাকে মহাস্নান করাইয়া পরিতৃপ্ত করে।

যাঁহারা মরমিয়া বা অন্তরের সাধক, তাঁহারা বলেন যে, এই আমাদের জন্ম মৃত্যুও এক বিপুল তীর্থ যাত্রা। সেই পরম মুখ্য দেবতার সিংহাসনতল হইতে আমরা যাত্রা করিয়া, নানা লোক-তীর্থ দর্শন করিয়া, আমাদের চিত্ত পাত্রে সকল তীর্থের দেবচরণামৃত লইয়া চলিয়াছি। সকল তীর্থের জলে যখন চিত্ত পূর্ণ হইবে, তখন সেই সর্ব্বতীর্থোদকে তাঁহার অভিষেক করিয়া আমাদের নিখিল লোকযাত্রা সার্থক হইবে।

এই যে পৃথিবী ইহাও এক তীর্থ। এইখানে দেবতা পঞ্চরসে দীপ্যমান। অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় দেবতার মহামন্দিরের পাঁচটী বাতায়ন এই লোকে উন্মুক্ত। অন্য লোকে, অন্য কোন্ কোন্ বাতায়ন দিয়া কোন্ রূপ কোন্ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় কে জানে? এই লোকের দর্শন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দে। এই পঞ্চামৃত রস অন্তরে গ্রহণ করিয়া এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। এই জগতে তাঁহার যে বিশেষ রূপ, তাহাকে যদি পরিপূর্ণ একটি প্রণাম করিতে না পারি—সমগ্র জীবনের ধ্যানে, বচনে, সেবায় একটি পরিপূর্ণ প্রণতি করিয়া যদি এই জগতের ভুবনামৃত গ্রহণ করিতে না পারি, তবে সেই মহাভিষেকের দিনে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, "কই আমার সেই ভুবন তীর্থের অমৃত কোথায়?" তখন যে হায় লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাঁড়াইতে হইবে! অতএব কর পরিপূর্ণ একটি প্রণাম—লও অন্তর ভরিয়া এই-লোকদেবতার চরণামৃত, নহিলে আবার যে বাহির হইতে হইবে সর্ব্বতীর্থযাত্রায়। জন্ম জন্মান্তর, পরিগ্রহ পাপের শাস্তি নহে, সে যে দেবতার অভিষেক বারি সংগ্রহের পুণ্যযাত্রা। অতএব "ত্বরান্বিত হও, অভিষেকের লগ্ন যে পিছাইয়া যাইতেছে; অতন্দ্রিত হও, দেবতা যে সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা করিতেছেন; অগ্রসর হও, তিনি যে পথ চাহিয়া আছেন; উদ্যত হও, বিরহের জ্বালা যে ব্যাকুল করিতেছে।"

কিন্তু হায়, ভুলিয়া যাই। এই জগতে জন্ম-পরিগ্রহ যে আমাদের একটি তীর্থ যাত্রা ইহা ভুলিয়া যাই; কেবল তীর্থধামের ধর্ম্মশালায় বসিয়া গোলমাল করি, আর দেবতার অভিষেকামৃতপাত্র পশ্চাতে লইয়া সম্মুখে রাখি সংসারের অনিত্য প্রয়োজন সাধন লোটা কম্বলের ভার। আর প্রাণপণ চেষ্টায় কেবল সেই ভারকেই স্ফীত করিয়া তুলি। যাইতে যে হইবে তাহা তো কবে গিয়াছি ভুলিয়া। হঠাৎ যখন এখান হইতে বাহির হইতে হয় তখন যে শূন্য পাত্র লইয়া যাত্রা করিতে হয়। হায় এই দুঃখ দূর করিতে হইলে ধ্যানে, বচনে, সেবায় পূর্ণ একটি প্রণতি করা চাই। পঞ্চামৃত রসে দীপ্যমান দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলা চাই—"এই যে তোমার রূপ দেখিলাম, প্রাণ ভরিল, এখন আমি আনন্দে যাত্রা করিব।"

এই তীর্থ যাত্রার গুরু কে? ইহার গুরু ও তিনিই।

আমি যে লোকে লোকে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছি, তিনিই আবার কালে কালে আমার হস্তে তাঁহার নব নব প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। প্রতি ঋতুতে ঋতুতে নব নব কুসুম-অর্ঘ্য আমার সম্মুখে তিনি স্থাপন করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন।

আর তাঁর যে নানা লীলা তাহাতেও তিনি ক্রমশ আমারই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁর যে অনন্ত স্বরূপ তাহাতে তিনি আমার কাছে আসিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি দয়া করিয়া নারায়ণ রূপে আমার কাছে আসিয়াছেন। তিনি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া, সখা হইয়া, স্বামী হইয়া, দাস হইয়া, দিন দিন আমার অন্তরের ঘনিষ্ঠ হইতেছেন। কেবল যে আমি তাঁহাকে পাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছি তাহা নহে, তিনিও যে আমাকে পাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। আমি ক্ষুদ্র হইতে পারি কিন্তু প্রেমের লীলায় আমার মূল্যতো সামান্য নহে। তিনিই যে আমার অন্বেষণে যাত্রা করিয়াছেন—ইহা দেখিয়াই তো আমি তাঁহার অন্বেষণে যাত্রা করিয়াছি। তাঁহার কাছেই শিক্ষা। মানুষকে ক্রমাগত শিক্ষা দিতেছেন, "তীর্থযাত্রী ভুলিয়া থাকিও না। তীর্থযাত্রার কথা ভুলিও না।"

তাই ভারতের সাধকমাত্রই ইহলোকেই নানা সাধন-তীর্থে যাইয়া যাইয়া সেই নিখিল তীর্থযাত্রাকে স্মরণে রাখিতে চাহেন। এই জগতেই নানা সম্প্রদায়ের নানা রসকে অগ্রাহ্য করিব না—অগ্রাহ্য তো করিবই না বরং হৃদয় ভরিয়া প্রণাম করিয়া সর্ব্ব বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া তাঁহার মহা অভিষেক পূর্ণ করিব। এই বোধই তো উদারতার বীজমন্ত্র। এই বোধ হইলে আর কি মানব অন্যের বৈচিত্র্যকে ঘৃণা করিতে পারে, না নিজের প্রবলতার দ্বারা অভিভূত করিতে পারে? যখন কেহ কাহারও বৈচিত্র্যকে পরাভূত করে তখন সে যদি জানে যে আমি ব্রহ্মের এক অপরূপ মূর্ত্তিকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছি, তবে কি সে আর এক মুহূর্ত্তও সাহস পায়! যে পরাভব স্বীকার করে সে যদি জানে ইহাতে আমি ব্রহ্মের এক স্বরূপকে পরাভূত হইতে দিতেছি, তবে কি আর সে দীন হইয়া পড়িতে পারে? এক জাতি যখন অন্য জাতির নিকট পরাভূত হয় বা এক জাতি অন্য জাতিকে পরাভূত করে তখন সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ভয়ের কথা ইহাই। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নারায়ণের বিচিত্র বিচিত্র রূপ। জগতের সকল জাতিকে যদি একবার হৃদয় ভরিয়া প্রণাম করিয়া করিয়া আসিতে পারি, তবে জীবন্ত নারায়ণকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিতে পারি। কিন্তু যখন এক জাতি অন্যের দাস হইয়া তার বৈচিত্র্যকে হারাইয়া অন্যের কাছে আত্মবিসর্জ্জন করে, তখন যে বিষম ক্ষতি হয় তাহা ধনের নহে, জনের নহে। তখন আমরা নারায়ণের এক স্বরূপকে হারাইয়া বসি। জগৎ হইতে তাঁহার এক বিচিত্র লীলা আমরা লুপ্ত করিয়া দেই। এই পাপ যে করে এবং এই পাপ যে সহে, তাহারা উভয়েই ব্রহ্মদেহে আঘাত করে। দেবতার মূর্ত্তিমাত্র ধ্বংস করিলে যদি কালাপাহাড় হইতে হয়, তবে যে এই প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেবতার অঙ্গে যে আঘাত করে, তাহাকে কি হইতে হইবে?

যাঁহারা তীর্থ-যাত্রী তাঁহারা ধন্য। যাঁহারা তীর্থ যাত্রা করিতে পারিলেন না, এই ভারতে তাঁহারা নিজেকে অতিশয় কৃপাপাত্র মনে করেন। এই হেতু যখন সাধক মণ্ডলীর মধ্যে কেহ তীর্থ যাত্রায় বাহির হয়, তখন সকলে তাহাকে ঘিরিয়া বলে, "সমস্ত দেহের প্রণামকে হস্ত যেমন প্রকাশ করে, তুমি তেমনি আমাদের মণ্ডলীর হস্ত হইয়া সকল তীর্থের দেবতার চরণামৃত স্পর্শ করিয়া আইস। সমগ্র বৃক্ষের পিপাসা যেমন পল্লব রূপে তাহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া আকাশের বর্ষণ পবন ও আলোককে অঞ্জলি ভরিয়া অন্তরে গ্রহণ করে, তেমনি সমগ্র মণ্ডলীর পল্লবের ন্যায় তুমি বাহিরে যাত্রা করিয়া, অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া নিখিল তীর্থামৃত রস-গ্রহণ করিয়া, এই আশ্রমের সকলের মধ্যে সেই নব জীবন রস সঞ্চার কর।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

বৌদ্ধ জীবন।

দুঃখের অস্তিত্ব একটি মহাসত্য।* মানবজীবনের অপরিহার্য্য অনন্ত দুঃখ যখন সিদ্ধার্থের প্রজ্ঞাগোচর হইল তখন তিনি ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, সাধারণ মানবকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। একটি দুঃখের অবসান হইতে না হইতেই দ্বিতীয় একটি দুঃখের উত্থান হইতেছে। উত্তাল তরঙ্গমালার তুল্য দুঃখপরম্পরা একটির পর আর একটি মানবকে আক্রমণ করিতেছে; তাহার সংগ্রামের বিরতি নাই!

সিদ্ধার্থের মনে প্রশ্ন উত্থিত হইল, এই দুঃখের মূলীভূত কারণ কি? মানব আত্মশক্তিদ্বারা এই দুঃখরাশি

* দুঃখ, দুঃখের উদ্ভব, দুঃখের নিবৃত্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় এই চারিটি বৌদ্ধশাস্ত্রে চতুরার্য্য সত্য নামে উক্ত হইয়া থাকে।

* উৎসব তিথি উপলক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পঠিত।

নিঃশেষে নিরাকরণ করিতে পারে কিনা? কি উপায় অবলম্বন করিলে এই দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে?

সাধারণ মানব আপন সত্তার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আপনি অবগত নহে; ঐহিক জীবন যাত্রায় শেষে সে কোন্ পরিণামে উত্তীর্ণ হইবে তাহা কখনো তাহার কল্পনায় উদিত হয় না; তাহার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক চিন্তা কোন্ পরিণামের সৃষ্টি করিতেছে সে তাহা অবগত নহে; তাহার বর্ত্তমান সত্তা কেমন করিয়া সম্ভব হইল সেই রহস্য সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আপনাকে আপনি না জানিয়া মানব আপনার সত্তা রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিরন্তর সংগ্রাম করিতেছে; অন্ধ যেমন আপনার গন্তব্যপথ দেখিতে পায় না, তথাপি দণ্ড হস্তে কোনরূপে যাতায়াত করে, মানবও তদ্রূপ অন্ধভাবে জীবন পথে চলিতে থাকে। সত্তারক্ষা করিবার জন্য এই সংগ্রামে মানব যেমন অশেষ দুঃখ পাইয়া থাকে তেমনি স্থূল সুখও লাভ করিয়া থাকে। জীবন এই সুখ দুঃখের সংমিশ্রণ। শশিকলার যেমন হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে, তরঙ্গে যেমন উত্থান ও পতন আছে, জীবনে তেমনি সুখ ও দুঃখ রহিয়াছে।

দুঃখের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। সমগ্র বিশ্বজীবন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানব যখন আপনার ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট সত্তা রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করে তখন তাহাকে দুঃখভোগ করিতেই হয়। সমগ্র জগতে সংযোগ বিয়োগের যে অমোঘ বিধান বিদ্যমান আছে দেবমানব কেহই সেই বিধান অতিক্রম করিতে পারিবেন না। যে শক্তিসমূহের সমবায়ে একটি স্বতন্ত্র সত্তার উদ্ভব হইল, একদিন না একদিন সেই শক্তিপুঞ্জ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবেই। যে মুহূর্ত্তে একটি সত্তার সৃষ্টি হইল সেই মুহূর্ত্তেই তাহার উপর জরাব্যাধিমৃত্যুর ক্রিয়া আরম্ভ হইল। মানবের সত্তা সীমার দ্বারা আবদ্ধ; যেখানে সীমা সেইখানেই অবিদ্যা; যেখানে অবিদ্যা সেইখানেই দুঃখ।

মানব যখন একটি স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে তখন তাহার মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই ছয়টি মুক্ত দ্বার দিয়া বাহিরের বিশ্ব প্রকৃতি তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, ইহারই ফলে মানবের মনে বেদনার সঞ্চার হয়, ঐ বেদনা নানা তৃষ্ণার আকারে আপনাকে প্রকাশ করে। মানব তাহার এই তৃষ্ণার দাবী সম্পূর্ণরূপে কিছুতেই পূরণ করিতে পারে না;—মন প্রেয় বলিয়া যাহা চায় তাহা সকল সময়ে পায় না, এবং অপ্রিয় বলিয়া যাহা বর্জ্জন করিতে চায় তাহাও সময়ে সময়ে তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়।

তৃষ্ণার রসদ যোগাইতে মানবের এই অসমর্থতাই তাহার যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত কারণ। যে মানব আপনাকে আপনি সম্যক্ জ্ঞাত নহে তাহার তৃষ্ণা লতার ন্যায় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মেঘবর্ষণে তৃণরাজি যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, তৃষ্ণাভিভূত ব্যক্তির দুঃখও তেমনি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাপরিবৃত ব্যক্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চবিষয় এই দশপ্রকার শৃঙ্খলে সংযুক্ত থাকিয়া বারংবার দুঃখ পাইয়া থাকে।

অবিদ্যাবশে মানব আপনাকে বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে কিন্তু সে এই অনন্ত বিশ্বরূপ মহাসাগরের একটি ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদ্‌মাত্র। স্বভাবতঃই তাহার মনে হয় যেন সে ভূতকালের, বর্ত্তমান কালের ও ভবিষ্যৎকালের চেতন অচেতন সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়াই সে তাহার ক্ষুদ্র সত্তার প্রীতিসাধনের জন্য নিয়ত চেষ্টা করিয়া থাকে; অথচ সংগ্রামের ফলে তুচ্ছ সুখোপকরণ লাভ করিয়া তাহার তৃষ্ণা শান্ত না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়; এই প্রকারে সে বৃহত্তর দুঃখ এবং উগ্রতর নৈরাশ্যের সম্মুখীন হইতে থাকে।

ক্ষিপ্রবেগে অশ্ব ছুটাইয়া সমতল ভূমির উপর দিয়া সারথি শকটারোহণে অগ্রসর হইতেছে। সে প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার প্রচণ্ড গতি অনুভব করিতেছে, বলদর্পিত অশ্বও পদপীড়িত পৃথিবীহইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিতেছে কিন্তু অত্যুচ্চ প্রাচীরের উপরে দণ্ডায়মান এক প্রহরী ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আদৌ লক্ষ্য করিতেছে না, সে দেখিতেছে একটি অখণ্ড পদার্থ পৃথিবীর উপরে নড়িতেছে; বায়ুবেগে আন্দোলিত কেশর যেমন অশ্বেরই দেহাংশ মাত্র, উক্ত অখণ্ড পদার্থটি তদ্রূপ ধরণীরই অংশমাত্র।

মানব যতদিন আপনার প্রীতিকামনায় তুচ্ছ সুখভোগের অন্বেষণ করিবে এবং আপনার ক্ষুদ্র সত্তাকে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া তুলিবে ততদিন সে কোনোক্রমে দুঃখের হাত এড়াইতে পারিবে না। আর যখন তাহার রাগ দ্বেষাদি থাকিবে না, চিত্ত শান্ত হইবে, তখনই ধর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া অলৌকিক আনন্দ লাভ করিবে।

মহাপুরুষ বুদ্ধের জীবন মানবকে এই কথাই বলিতেছে—"হে মানব, যে ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি তোমাকে বিশ্বহইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে ঐ ভেদবুদ্ধি তোমার প্রার্থনীয় নহে; বুদ্ধিস্থির করিয়া তুমি শীলগ্রহণ কর, মঙ্গলব্রত সাধনের বিমল আনন্দ লাভ করিয়া ক্রমশঃ তোমার সকল দুঃখের ধ্বংস হইবে। পুষ্পিত তরুর ন্যায় তুমি রাগ দ্বেষাদি ম্লান কুসুমগুলি ত্যাগ কর। বোধকে জাগ্রত করিয়া তুমি আপনাকে প্রসারিত করিলেই সকল

হীনতার, সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেশকালের অতীত বিশ্বের সহিত ঐক্য অনুভব করিবে ; এই ঐক্যানুভূতিই তোমার প্রার্থনীয়। এই বোধই সকল সত্যের সার। সঙ্কুচিত হইও না, নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে থাক, তুমি কল্যাণকর নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে।

হে মানব, সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া তুমি সার সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, ঐ সত্যের বীজ তোমারি অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে। তোমার ক্ষুদ্র সত্তানুভূতি কি কখনো তোমাকে বিমল আনন্দ দান করিয়াছে ? তুমি কোন্ বস্তুর জন্য সংগ্রাম করিতেছ ? স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুখ, শান্তি, সাফল্য খ্যাতি হয়ত তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয় হইবে ? কিন্তু ইহারা কি তোমাকে শাশ্বত আনন্দ দান করিতে পারে ? জরা ও ব্যাধি তোমার স্বাস্থ্যের বিনাশ সাধনের জন্য প্রত্যহ যুদ্ধ করিতেছে, যাবৎ তুমি চিত্তে শান্তিলাভ করিতে না পারিবে তাবৎ সম্পদ ভোগ সুখ, শক্তি, সাফল্য, খ্যাতি কিছুতেই তোমাকে বিমল আনন্দ দান করিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র সুখ-ভোগের বন্ধনগুলি ছিন্ন করিয়া তুমি যখন সত্যের বিমল-জ্যোতির সাক্ষাৎকার লাভ করিবে তখন দেখিতে পাইবে তুমি যে কল্যাণ লাভ করিয়াছ তাহা কত গভীর, কত পরিপূর্ণ, কেমন অনন্ত প্রসারী।

হে কল্যাণকামী মানব, তোমার চিত্ত-অশ্বকে সংযত করিতেই হইবে, তৃষ্ণার মূল উৎপাটন করিতে হইবে। নচেৎ নদীর স্রোত যেমন কূলজাত নলকে পুনঃ পুনঃ বক্র করিয়া থাকে, কামলালসা তেমনি তোমাকে বারংবার আক্রমণ করিবে। মূল অচ্ছিন্ন থাকিলে বৃক্ষ যেমন পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হয় তেমনি তৃষ্ণার মূল উৎপাটিত না হইলে দুঃখ পুনঃ পুনঃ আসিবেই। তুমি ঊর্ণনাভের ন্যায় ক্ষুদ্র জাল রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, মণ্ডূকের ন্যায় কূপকেই সর্ব্বস্ব মনে করিতেছ, একবার কূপ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিলেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ গোচর হইবে। উত্তিষ্ঠ, তুমি ওঠ জাগ্রত হও ; স্বার্থত্যাগ করিয়া পরার্থে জাগ্রত হও, ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়া বিরাটকে গ্রহণ কর ; আপনার মধ্যে ক্ষুদ্র আপনাকে অন্বেষণ না করিয়া সর্ব্বজীবের ও সর্ব্বভূতের মধ্যে আপনার বৃহৎ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কর।

হে ধর্ম্মপথের যাত্রী, তুমি তোমার প্রীতিকে বাধাহীন সীমাহীন করিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রসারিত কর। তুমি ইহ জীবনেই আপনার বিরাট সত্তা অনুভব করিতে পার ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ গৌরব ; তুমি স্বয়ং আপনার প্রদীপস্বরূপ হইয়া, আত্মশক্তি দ্বারা চরম কল্যাণ লাভ করিতে পার ইহাই তোমার পরম গৌরব। যে দিন বিমল বোধি লাভ করিয়া তুমি ধন্য হইবে সে দিন তোমার স্বার্থ বিশ্বজনের স্বার্থ হইবে, সেদিন তোমার কল্যাণ বিশ্ববাসীর কল্যাণ হইবে।"

ইহজীবনেই আপনার বিরাটসত্তা অনুভব করিয়া নির্ব্বাণামৃত লাভ সম্ভবপর বলিয়া বৌদ্ধসাধু জীবনকে অতিমূল্যবান্ বলিয়া মনে করেন। সুখ দুঃখ আনন্দ নিরানন্দ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বভূতের মঙ্গলসাধনে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাকে অর্পণ করিয়া থাকেন ; কারণ তিনি অনুভব করিয়া থাকেন যে তিনি বিচ্ছিন্ন নহেন, সমস্তের সহিত নিগূঢ় যোগে সংযুক্ত এবং সর্ব্বভূতের মঙ্গলই তাঁহার মঙ্গল। আপনার ক্ষুদ্রসত্তার সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন এবং বিরাট সত্তার মধ্যে অবস্থানই বৌদ্ধজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

শ্রীশরৎকুমার রায়।

গণতন্ত্রতায় সংযমের স্থান।

হিবার্ট জর্ণালের অক্টোবর সংখ্যায় সম্পাদক এল্. পি, জ্যাক্স্ "Democracy and Discipline" অর্থাৎ 'গণতন্ত্রতা ও সংযম' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রথম যখন মানুষ গণতন্ত্রশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তখন মনে করিয়াছিল যে ইহার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনতার আনন্দলাভ করিবে—সে যে কাহারও কর্ত্তৃত্বাধীন, বাহির হইতে যে তাহার উপর কোন শাসন চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে—এ ভাব তাহার মনে থাকিবার কোন কারণই ঘটিবে না। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে গণতন্ত্র তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হ্রাস বই বৃদ্ধি হইতেছে না—পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী শাসন মানুষকে স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে। ডিমোক্রাসির অনুগামী ডিসিপ্লিন যে কি পরিমাণ মানুষকে ক্রমেই মানিয়া লইতে হইবে, ইহার আলোচনা উত্থাপন করিয়া জ্যাক্স্ সাহেব আধুনিক একটি সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে পাঠকসাধারণকে খুবই সচেতন করিয়া দিয়াছেন এবং ডিমোক্রাসি সম্বন্ধে আধুনিক মোহান্ধ সংস্কারকেও খুব কঠিনভাবে আঘাত করিয়া তাহার সত্যরূপটিকে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহার সেই আলোচনার সারমর্ম্ম তাই এ দেশীয় পাঠকসমাজের জন্য এই প্রবন্ধে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

১

ষ্টেটের অধিকার যাহাতে অতিরিক্তরূপে প্রসার লাভ না করে এজন্য হর্বার্ট স্পেন্‌সার তাঁহার দেশবাসিগণকে সতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই নির্দ্দেশ কিছুমাত্র গৃহীত হয় নাই। ব্যক্তির উপর ষ্টেটের প্রভাব অপ্রতিহত ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। শরীর, মন, চরিত্র, বিষয়বৈভব সকল ক্ষেত্রেই মানুষ ষ্টেটের অধীন—গত ত্রিশবৎসরে যে সকল আইন সৃষ্ট হইয়াছে তাহার আলোচনা করিলেই এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয়ের কারণ থাকিবে না। সুতরাং এখন এ প্রশ্ন উত্থাপন করা বৃথা যে ষ্টেটের আধিপত্য প্রতি ব্যক্তির উপর কি পরিমাণে থাকা উচিত—সকল দিকেই সে আধিপত্য স্পষ্টতই বিরাজমান।

এখন যে প্রশ্ন আমাদের ভাল করিয়া ভাবা দরকার তাহা এই :—ষ্টেটের অধিকার ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শাসন সর্ব্বতোভাবে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইবার ভাব কি জনগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইতেছে? যদি বল কেন এ শাসন তো জনগণ নিজেরাই নিজেদের উপর গ্রহণ করিয়াছে, এতো তাহাদের সৃষ্ট—কিন্তু নিজেদের বোঝা বহন করাই কি সকল সময়ে সুসাধ্য হয়? আমরা তো অনেক সময় নিজেদের চরিত্রের উন্নতির জন্য কত নিয়ম করি—সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য সময়সূচী তৈরি করি—কিন্তু শেষে দেখি যে সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার মত নৈতিক বল ও অধ্যবসায় আমাদের মধ্যে নাই। নিয়ম সম্বন্ধে কড়াকড় করিলেই যে নিয়মপালন সহজ হইয়া আসে এ কথা বলা যায় না—শেষটা নিয়মের প্রতিই অশ্রদ্ধা জন্মে। ব্যক্তিগত জীবনে এ দৃষ্টান্ত যেমন দুর্লভ নহে, জাতিগত জীবনেও দুর্লভ হইবে কেন? অধুনা ষ্টেটের শাসন ঠিক এমনি ভাবে চলিয়াছে যেন শাসন মানিয়া লইবার অভ্যাস মানুষের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়া আছে—অথচ এই কালটাই নিয়ম শাসনকে নীরবে মান্য করিবার কাল নয়—কারণ এ সম্বন্ধে মানুষের খুবই অধীরতা লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক শাসনের অধীনতা যেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে আছে, সেখানে ইহার সংগঠনে কতকগুলি বিশেষ গুণ লক্ষ্য করা যায়। সর্ব্বপ্রথম—একটি নৈতিক গুণ—তাহাই ইহার ভিত্তিস্বরূপ। তাহা সাধারণের মঙ্গলার্থে নিজের স্বার্থবিসর্জ্জন দিবার ইচ্ছা। অবশ্য ধর্ম্ম হইতেই এই নৈতিক গুণটি উদ্ভূত হয়—খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যেই ইহার ভাব রহিয়াছে। তারপর দ্বিতীয় গুণ ঐতিহাসিক অনুভূতি—অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণের সৃষ্ট অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির প্রতি শ্রদ্ধা। এ দুইটিই খুব মহৎগুণ। তৃতীয় আর একটি গুণ আছে তাহা যথেষ্ট মহৎ না হইলেও খুবই প্রয়োজনীয়। তাহাকে সংক্ষেপে 'ড্রিল' বলা যায়—তৎপরতা, ব্যবস্থাবুদ্ধি, মনোযোগ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কর্ত্তব্য সাধন, সময়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণ তাহার অন্তর্ভুক্ত। এই কয়েকটি গুণের সংযোগে সামাজিক শাসনের অধীনতা বস্তুটি সম্ভব হয়—নাহলে তাহা কোন মতেই দাঁড়াইতেই পারে না।

অথচ এই শাসনকে মানিয়া লইবার চর্চ্চার দিকে এ যাবৎকাল কোন মনোযোগই দেওয়া হয় নাই। ইহার যেটুকু লক্ষণ ইংলণ্ডে দেখা যায় সে কেবল কোন না কোন প্রয়োজনের চাপে কোন না কোন সংগ্রামের ভিতর দিয়া জাগিয়াছে—ধর্ম্মও কিছুটা পরিমাণে তাহাকে অগ্রসর করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, শাসন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন স্বীকার করিবার অভ্যাসের প্রতি এত অবহেলা ঘটিল কেন?

এই অবহেলার তিনটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম—আইনের প্রতি বাধ্যতার ভাব ব্রিটিশ জাতির একরকম প্রকৃতিগত বলা যায়। গত একশত বৎসরের বিধিপ্রণয়নের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, অনেক আইন সম্বন্ধে অধিকাংশ জনসাধারণ ক্ষতি ও অন্যায় বোধ সত্বেও নির্ব্বিবাদ ও সহিষ্ণু থাকিয়া গিয়াছে। যতই কেন কঠিন হউক্ না,—আইন হইয়া গেলে ব্রিটিশ জাতি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না—এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাওয়ায় লোকে মনে করে যে তবে বুঝি কাঠিন্যের আর সীমা থাকিবার দরকার নাই—যত ইচ্ছা ভার বুঝি নিরাপদে ও সহজেই চাপান যায়। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সকল জিনিসের মত আইনের প্রতি বাধ্যতারও একটা সীমা আছে—সেই সীমা ছাড়াইলেই তখন নিয়ম ভাঙিবার কলকৌশল আবিষ্কার করিয়া ষ্টেটকে জনগণ সর্ব্বদাই বিপন্ন ও পরাভূত করিতে থাকিবে। এবং একবার সে অবস্থায় গেলে আর কোন সুসংস্কারের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

দ্বিতীয় কারণ,—ষ্টেটের শাসনের যে সকল জটিল কলবল এখন লক্ষ্য করা যায় সে গুলি অনেকটা পরিমাণে আধুনিক জিনিস। বাহিরের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু মানুষের মনের সংস্কার এখনও পূর্ব্বতন অপেক্ষাকৃত সরল ব্যবস্থার অনুযায়ী হইয়া আছে। ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিভাবের দিকে এখন সমস্ত বিধি বিধানের ঝোঁক পড়িয়াছে—অথচ তাহাতে প্রত্যেক প্রজার কর্ত্তব্যজাল যে কি বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে সে দিকে তাহার সম্পূর্ণ খেয়াল হয় নাই। সে দিন লয়েড্ জর্জ্জ বলিয়াছেন যে ইন্‌সিউরেন্স অ্যাক্টের দ্বারা সমস্ত জাতির মধ্যে রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য খুব একটা "নড়াচড়া" দেখা যাইতেছে। কিন্তু কোন সমাজ-সংস্কারের জন্য

এ পর্যন্ত ব্রিটিশ জাতিকে খুব ব্যাপকভাবে এবং দ্রুত-গতিতে "নড়িতে চড়িতে" দেখা যায় নাই। সেই জন্য প্রশ্নটা এখন এ নয় যে নূতন বিধিবিধানগুলি প্রজাকুলের পক্ষে ভাল কিনা—কিন্তু আসল প্রশ্নই এই যে প্রজাকুল নূতন বিধিবিধান গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট ভাল কিনা।

তৃতীয় কারণ—গণতন্ত্রতার একটা অত্যন্ত অবচ্ছিন্ন 'থিওরির' উপরে লোকের অন্ধ বিশ্বাস। লোকের যুক্তি এই যে—জনগণ যে নিয়ম নিজেরা রচনা করিয়াছে যে নিয়ম তাহারা নিজেরা রক্ষা করিবেই। সকলের সম্মতির উপর যে শাসনের নির্ভর তাহার বিরুদ্ধে কি কেহ যাইতে পারে? নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধানের বিরুদ্ধাচরণ নিজেরাই করিবে, এ কথা মনে করা নিজেদিগকে অত্যন্ত অবিবেচক ও অযৌক্তিক মনে করারই নামান্তর। গণতন্ত্রের সপক্ষে এ যুক্তি খুব শস্তা আর এ যুক্তিতে সকল প্রশ্ন একেবারেই খতম হইয়া যায়। অথচ এই প্রশ্নেই আমি আমার আলোচ্য বিষয়ের একেবারে মূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। গণতন্ত্রতার আদর্শ হইতেই যে শাসনাধীনতা আপনিই আসে একথা আমি মানিনা। বরং এই গণতন্ত্রতার শাসন পাশ একদিকে ক্ষণস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া অন্যদিকে তাহার দৃঢ় হওয়ার তেমনিই প্রয়োজন।

২

গণতন্ত্রশাসনে বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা ও বাধ্যতা যে কলের মত সহজ ও অনায়াস নহে তাহার বিস্তর প্রমাণ আধুনিক ঘটনাবলী হইতে দেওয়া যায়। থিওরি হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের শাসনপ্রণালীর চেয়ে উৎকৃষ্টতর গণতন্ত্রশাসন ব্যবস্থা নাই—কিন্তু সেখানে যাহা কিছু বিপত্তি সে এই বিধানের প্রতি যন্ত্রবৎ বাধ্যতার অভাব হইতেই ঘটে। ইংলণ্ডেও এ অভাব যথেষ্ট বিদ্যমান। সময় সময় এ দেশে যে রকম স্পষ্টভাষায় কোন ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ প্রচারিত হয় তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে গণতন্ত্রতার থিওরি যাহাই থাক্—কার্য্যত সে থিওরি খাটিতে দেখা যায় না। মিঃ বোনার ল সে দিন আল্‌ষ্টারবাসীগণকে স্পষ্টই বলিলেন যে পার্লেমেণ্ট হোমরুল জারি করিলেও তিনি তাহাদিগকে ইহার বিরুদ্ধতা করিতে সাহায্য করিবেন। তারপর নূতন ইনসিউরেন্স অ্যাক্ট্ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের চিকিৎসকমণ্ডলীরা যে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করিতেছেন এবং এ বিষয়ে যে তাঁহারা কোন কাজ করিবেন না বলিতেছেন—তাহারই বা অর্থ কি! গণতন্ত্র শাসনের থিওরি কি এ সকল ঘটনার সম্ভাবনাকে দূর করিতে পারে? অবশ্য যাহারা এরূপ বিদ্রোহাচরণ করে তাহারা বলিবে যে তাহাদের এ অবাধ্যতা "যেমন-আছে-গণতন্ত্রতার" প্রতি, কারণ "যেমন-হওয়া-উচিত-গণতন্ত্রতার" প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। কিন্তু যদি সে কথা ধর, তবে গণতন্ত্রশাসনের মধ্যেই যে জনগণের যন্ত্রবৎ শাসনকে স্বীকার করিবার ভাব বিদ্যমান একথা একেবারেই কাঁচিয়া যায়। সমস্ত দেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন, সেগুলি সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা যদি বাহিরের যে কোন এক দল স্থির করিবার ভার নেয়, তবে দলাদলি জিনিসটা ক্রমশ পাকিয়া না উঠিবে কেন? কতগুলি বিশেষ ব্যবসায়ী দল কোন আইন তাহাদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়া যদি সে সম্বন্ধে আপত্তি করে, তবে ঐ একই উদ্দেশ্যে ভিন্ন আর দল—ধর শ্রমজীবী দল—বিরোধ না করিবে কেন? স্ত্রীলোকেরা পুরুষের কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বিধি যদি অস্বীকার করে, তবে ভবিষ্যতে এমন পুরুষ অনেক জুটিতে পারে, যাহারা কোন বিধি সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের হাত আছে বলিয়াই সে বিধি অগ্রাহ্য করিতে পারে। এ সকল দলাদলি ঘটিলে তখন গণতন্ত্র শাসন কি উপায় অবলম্বন করিবে, কেমন করিয়া এ গুলি নিবারণ করিবে? যদি বল জবরদস্তির দ্বারা নিবারণ করিবে, তবে আর গণতন্ত্রশাসনের মূল্যটা রহিল কোথায়? প্রজারা স্বাধীন ভাবে আপনাদের শাসন আপনারাই গ্রহণ করিয়াছে, এ তত্ত্ব আর স্থান পায় কেমন করিয়া?

আসল কথাটা এই, বাহির হইতে যদিচ দেখা যায় যে, ষ্টেট্ নামক যন্ত্রটিকে জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা চালনা করিতেছে, তথাপি সেই যন্ত্রই প্রকৃতপক্ষে জনসমূহের ইচ্ছাকে প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই যন্ত্র জিনিসটা যে কেবল এই কালের জনগণের ইচ্ছার প্রতিরূপের মত তাহা নহে—কত যুগ যুগ ধরিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। প্রতি যুগেই ইহার কিছু না কিছু জটিলতা সংসাধিত হইয়াছে, ইহার জোড় জোড়ের কিছু না কিছু সূক্ষ্ম নৈপুণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহার গতিটিকেও এক বিশেষ পথে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্য এই যন্ত্রটিকে এখন যথেচ্ছা, নাড়াচাড়া করা কোন একদল লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহাকে ঠিকমত বাগানো তাহাদের পক্ষে অসম্ভব—ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই চলিতে হয়—ইচ্ছা খাটানো ছাড়িয়া দিতে হয়। যাহারা কার্য্যত কি হয় তাহার খোঁজ রাখে না, তাহারা অনায়াসেই মনে করিতে পারে যে প্রজাসাধারণ ইচ্ছামত ষ্টেট্‌কে ভাঙিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িতে পারে। কিন্তু বাস্তবিকই ষ্টেট্‌যন্ত্রের দ্বারাই প্রজাসাধারণের ইচ্ছা নিয়-

ত্রিত্ব—ইহার মধ্যে কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন কোন মতেই সম্ভাবনীয় নহে। বাহির হইতে অনেকেই চেঁচামেচি করিয়া বলিতে পারে যে "এমন হওয়া উচিত বা তেমন হওয়া উচিত—আমরা যদি শাসনের ভার পাইতাম তবে আমরা তাহাই করিতাম"—কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র সুর বদলাইয়া যায়—তখন দেখা যায় যে ইচ্ছামত কিছুই করিবার জো নাই, করিতে গেলে আঘাত এক জায়গায় নয় অনেক জায়গায় এবং অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন শাসনযন্ত্র খুব সরল ও সিধা থাকে, ততক্ষণই তাহাকে ইচ্ছামত ভাঙা গড়া যায়, কিন্তু একবার তাহাকে জটিল হইতে দিলে, অনেক মানুষে মিলিয়া তাহাকে কালে কালে পাকাইয়া তুলিলে, তখন সেই যন্ত্রই মানুষের উপর কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করে, মানুষের কর্ত্তৃত্বের স্থান সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া আসে। সেইজন্য এইরূপ গণতন্ত্র শাসনে একটা মস্তবড় এই যে হঠাৎ সমস্তটা না ধূলিসাৎ হইয়া যায়। বিদ্রোহ বা বিরুদ্ধতা ইহাকে কিছুই করিতে পারে না—সে দিক দিয়া কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু এই জিনিসটাই পাছে এমন আহত হয় যাহাতে একেবারে চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়ে, ইহাই সকলের চেয়ে গুরুতর আশঙ্কা।

৩

আরও একটু স্পষ্ট করিয়া আমাদের চিন্তনীয় বিষয়টিকে আলোচনা করা যাক্। আমি বলিলাম যে ষ্টেট্‌যন্ত্রের যেদিকে ঝোঁক সেদিকেই শাসনযন্ত্রীদিগকে বাধ্য হইয়া চলিতে হয়। কিন্তু একটা উদাহরণ দিলেই একথাটা পরিষ্কার হইবে।

এখনকার ষ্টেটের যেদিকে প্রবলতম ঝোঁক তাহারি কথা পাড়ি—সোস্যালিজ্‌ম্। সকল মূলধন ষ্টেটের অধিকারে এবং সকল শ্রমকেও ষ্টেটই নিয়ন্ত্রিত করিবে—ইহারি দিকে অধুনা চেষ্টা চলিয়াছে। মূলধন খাটাইয়া যে প্রকৃত ধন উৎপন্ন হইতেছে তাহা এক্ষণে অসম ভাবে বিভক্ত হয়। সেই ধন উৎপাদনে যাহারা সকলের চেয়ে কম খাটে, তাহারাই সকলের চেয়ে অধিক অর্থের অধিকারী হয়। কিন্তু ক্রমশঃ এই ভাগ যাহাতে সমান হয় তাহার দিকে ষ্টেট দৃষ্টি দিবে।

অর্থনৈতিক দিক হইতে এরূপ চেষ্টা ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করিতেছি না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে যদি কখনো এই চেষ্টা সফল হইয়া উঠে, তবে কি সকল লোকের দাবী সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যাইবে—তাহারা কি খুসী হইবে? যদি বল—বাঃ খুসী হইবে নাতো কি—যাহারা শ্রমী তাহারা তাহাদের শ্রমলব্ধ ফল আরও বেশি করিয়া পাইবে—ইহাতে তাহাদের সুখ বই অসুখ কোথায়?

কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতি বলিয়া একটা পদার্থ আছে—তাহার নিয়মকানুন বহু পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছে। একজন ভাল গায়ককে তুমি সঙ্গীতের জন্য বেশ একটু অর্থ পুরস্কৃত করিলে—তোমার মনে হইল যে তুমি তাহার ঠিক প্রাপ্যটিই দিয়াছ। কিন্তু সে তাহা মনে করে না। তুমি যদি দাও পঞ্চাশ—সে চায় একশত মুদ্রা। ঠিক্ সেইরূপ শ্রমীদের বেতনের হার যে স্থিরীকৃত হইবে, কোথায় তাহার সীমা টানিবে—যেখানে টানিতে বাধ্য হইবে, সেখানে বেতনভুক্ শ্রমী যে সন্তুষ্ট হইবে এ ভরসা তোমাকে দেয় কে? একজন ব্যক্তিবিশেষ বেতনের হার স্থির করিলে সে অবিচার করিতে পারে, কিন্তু ষ্টেট্ তাহা স্থির করিলে অবিচারের সম্ভাবনা নাই এ কথাও মনে করিবার কোন হেতু নাই। কারণ, দেখ না কেন, এখনকার গর্ভমেণ্ট প্রজাসাধারণের উপর কতগুলো ট্যাক্স বসাইয়াছে এবং মনে করিতেছে যে সে ন্যায্যমতই কাজ করিতেছে—ইহাতে কাহারও অসন্তোষের কোন কারণ নাই। কিন্তু সন্তোষ কি বাস্তবিকই সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছে? না। সুতরাং যদি আবার ট্যাক্স ছাড়া তাহাকে বেতন স্থির করিয়া দিবার ভার দাও, তাহা হইলে অসন্তোষ বাড়িবে বই কমিবে এ কথা মনে কর কি হিসাবে? সোস্যালিষ্টের আদর্শমত ষ্টেট্ গড়িয়া উঠিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এ দিক্ দিয়া অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে না। তার পর আরও কত কথা ভাবিবার আছে—হয় ত কয়েকবার খুব খারাপ সময় গেল, ফসল ভাল হইল না, কোন নূতন মহামারীর আবির্ভাব হইল, জন্মসংখ্যা হ্রাস হইল, কোন একটা যুদ্ধে সমস্ত দেশের অর্থ শোষিত হইল। এ সকল দুর্দৈব ঘটিলে তখন যদি ষ্টেট্ বেতনের হার কমাইয়া দেয়, তবে কি প্রসন্নচিত্তে সকল মানুষ তাহা স্বীকার করিয়া লইবে?

এখানেও সেই একই কথা আসে—যে কথা দিয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করা গিয়াছে। শাসনকে মানিয়া লইবার অভ্যাস, বিধানের প্রতি বাধ্যতা না থাকিলে কোন শাসন-ব্যবস্থা—বিশেষত গণতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা—কখনই মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না।

সোস্যালিষ্টগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদের প্রোগ্রামের ভাল দিক্‌টাই ধরিয়া থাকেন—লাভের দিক্‌টাই দেখাইয়া মানুষকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু লাভ যেমন হইতে পারে, সেইরূপ ক্ষতির সম্ভাবনাটাও যে আছে, এ কথা ভাবা উচিত। লাভের অংশ সকলে মিলিয়া অপেক্ষাকৃত সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইব, আর ক্ষতির বেলাতে কি করিব? ক্ষতিও সেইরূপ সমান ভাগে ভাগ তো করিতে হইবে? ধর যদি কোন সময়ে ছাইপাঁশ ক্যাসান না হয়, তখন কি ষ্টেট্, কোর্ত্তা যাহারা তৈরি করে তাহাদিগকে

হাটবিক্রেতাদের সাহায্য করিবার কথা বলিবে? যদি প্রোটেষ্টাণ্টগণের ধর্ম্মমত কোন সময়ে খর্ব্ব হইয়া রোমানক্যাথলিকদের মতই বড় হইয়া উঠে, তখন ক্ষতির বেলায় রোমানক্যাথলিকগণ কি প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মযাজকদের দৈন্য দূর করিবার জন্য নিজেদের লভ্যাংশ কিয়ৎপরিমাণে ছাড়িয়া দিবে? এ কথা বলা বাহুল্য—যে মনুষ্যপ্রকৃতির মধ্যে যে স্বার্থত্যাগস্পৃহা যথেষ্ট আছে তাহা আমি বিশ্বাস করি—কিন্তু কোনরূপ "ডিসিপ্লিন"কে গ্রহণ করিবার অভ্যাস না থাকিলে সহসা কোন সমাজকে পরস্পরের দায় গ্রহণ করিতে বলা মিথ্যা হইবে। সুতরাং সোস্যালিষ্টগণ যদি দরিদ্রদিগকে এই কথা বলিয়া লুব্ধ করেন যে তাহাদিগকে কোন বোঝা বহিতে হইবে না—তাহারা মূলধনওয়ালাদের লাভের অংশ অনায়াসে ভোগ করিতে থাকিবে—তবে সে কথা তাঁহাদের কোন না কোন সময়ে অত্যন্ত অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইবেই। কারণ লাভ ও ক্ষতি মনুষ্যসমাজে উভয়ই পালা করিয়া আসে—তাই লাভের অংশ সকলে ভাগ করিয়া লইবে এ কথা যেমন বলা উচিত, ক্ষতির অংশ ভাগ করিয়া লইবার কথাও তেমনিই বলা উচিত। কিন্তু সে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা উচিত যে, কোন মনুষ্যসমাজের অপরিমিত দাবী মিটাইতে পারে, তাহার স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করিতে পারে এমন শাসন-ব্যবস্থা পৃথিবীতে কুত্রাপি মিলিবে না। মানুষ যদি সংযত হয় তবেই তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারা সম্ভবপর। সোস্যালিজ্‌মের অভিপ্রায় সেইরূপই—তাহা মানুষকে সর্ব্বতোভাবে সংযত করিয়া সুখী করিবে—ইহাই তাহার ভিতরকার কথা। কিন্তু যদি মানুষের স্ব-ইচ্ছার আর রাশ কোথাও না থাকে, যদি তাহার লোভ অপরিমিতরূপে বাড়িয়াই যায়—যদি বাধ্যতার চর্চ্চাতে সে একান্ত বিমুখ হয়—তবে সোস্যালিজ্‌মের ব্যবস্থাস্বরূপ ষ্টেট্ একদিনও টিঁকিতে পারিবে না। কোন শাসনপ্রণালী ভাল কি মন্দ বিচারের পূর্ব্বে জনসমূহ তাহাকে স্বীকার করিবার পক্ষে যথেষ্ট ভাল কি না—অর্থাৎ জনসমূহের মধ্যে বাধ্য হইবার ভাব যথেষ্ট আছে কি না তাহাই দেখিবার বিষয়।

৪

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে গণতন্ত্র শাসনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাকুলের বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা ও বাধ্যতা যে যন্ত্রের মত আপনিই সম্ভব হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে। ক্রমেই আমরা এমন একটি ব্যবস্থার সম্মুখীন হইতেছি যেখানে একদিকে যেমন ক্ষমতার অধিকতর প্রসার অন্য দিকে তেমনি বাধ্যতার অধিকতর প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি পার্লেমেণ্টকে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইতে হয়—আর তা না হইলে পার্লেমেণ্টের শাসনই মিথ্যা হইবে—তবে সেখানে এমন সকল লোকের প্রয়োজন হইবে যাহারা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের কাছে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। যখন স্বেচ্ছাচারী রাজাদের শাসনের কাল ছিল, তখনও লোকে এই কথা বলিয়াছে যে যিনি নিজে অন্যের অধীন হইতে জানেন তিনিই সকলের প্রভু হইবার যোগ্য। কিন্তু সে কথা আধুনিক গণতন্ত্র পার্লেমেণ্ট সম্বন্ধে খুবই খাটে। শাসনের ভার পাইবামাত্র আপন আপন খুসীমত যদৃচ্ছা কার্য্য করিলে তাহার ফলে প্রজাসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ অধিকতর প্রকট হইতে থাকিবে—যেমন এমেরিকায় এখনই দেখা যাইতেছে। প্রজাদের মধ্যে 'ডিসিপ্লিন' না থাকিলে ক্রমেই ষ্টেটের ইচ্ছার সঙ্গে প্রজাদের ইচ্ছার বিরোধ হইয়া উভয়ের মধ্যে কেবল ছলচাতুরী, পরস্পরকে নষ্ট করিবার চেষ্টা, এবং নানাপ্রকার দুষ্ট ভাব প্রবেশ করিয়া সকল মঙ্গলবিধানের প্রতিষ্ঠাকে দূরপরাহত করিতে থাকিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গণতন্ত্র শাসনের প্রধান সমস্যাই এই শাসনপ্রণালীর অনুকূল করিয়া প্রজাকে শিক্ষার দ্বারা গড়িয়া তোলা। শুধু যে রাষ্ট্রতত্ত্ব অধ্যয়ন করাই এ শিক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্ত তাহা মনে করা ভুল। সংযত হইবার শিক্ষা—আপনার ইচ্ছাকে সকলের সম্মিলিত শুভ ইচ্ছার অনুগত করিবার শিক্ষাই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ডিমোক্রাসিতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাতন্ত্র করিয়াই তুলিয়াছে—সে যে কাহারও অধীন নয়—তাহার অধিকারের যে কোনখানে রাশ নাই—এই একটা দুর্দ্দম সংস্কার ও অশান্ত ভাব তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া তাহার গুরুর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাতন্ত্রতাকে স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম করিলে মানুষের পরম দুর্গতির সম্ভাবনা—কারণ সেরূপ স্বাধীনতা কুত্রাপি নাই এবং কখনও কোথাও হইতেই পারে না। সকলে মিলিয়া শাসন মানেই 'সকল' নামক একটি অখণ্ড পদার্থকে গড়িয়া তোলা ও পদে পদে সেই "সকলে"র দিকে তাকাইয়া নিজেকে খর্ব্ব করা, সংযত করা, শান্ত করা ও সন্তুষ্ট করা। সোস্যালিজ্‌ম্ প্রভৃতি নূতন আন্দোলন যে তত্ত্ব উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে এইদিকে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু তাহারও মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে যাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সোস্যালিজ্‌ম্ যে একদল ধনী লোককে নিয়মনিগড়ে বাঁধিয়া সংযত করিবে এবং দরিদ্রদের উপর কোন ভার চাপাইবে না, এরূপ মনে করিবার হেতুমাত্র নাই। ওল্ড এজ্ পেন্‌সন, ষ্টেট্ ইন্‌সিউরেন্স, মজুরীর নিয়তম বেতনের হার ইত্যাদি

নানা চেষ্টার দ্বারা ক্রমেই দেখা যাইবে যে সকলকেই খুব একটি সংযমের মধ্যে ও বাধ্যতার মধ্যে ভবিষ্যতে আসিতে হইবে—কি ধনী, কি দরিদ্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ইংলণ্ডে এখনও প্রচলিত আইনের প্রতি বাধ্যতা সে দেশের জাতীয় প্রকৃতিগত একটা মহৎ গুণ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অশান্তি ও বিরুদ্ধতার ভাব সেদেশে কার্য্য করিতেছে বলিয়াই আশঙ্কা হয় যে কত দিন পর্য্যন্ত সেই বিধির প্রতি শ্রদ্ধা টিকিবে। যদি গণতন্ত্র শাসনকে আমরা স্থায়ীভাবে রক্ষা করিতে চাই—যদি শাসয়িতা ও শাসিতের মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান রচনা করিতে আমরা ভয় পাই তবে এ কথা আমাদিগকে মানিতেই হইবে যে উভয়ের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে দূর করিবার সময় আসিয়াছে। একদিকে বিধানের প্রতি অটুট্ বাধ্যতা অন্যদিকে সাধারণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মসংযম—এ দুইই তুল্যরূপ প্রয়োজন হইয়াছে। নহিলে এই প্রকাণ্ড একটা যন্ত্র কোন্ দিন ধূলিসাৎ হইয়া ভাঙিয়াচুরিয়া একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটাইবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সুখ-মৃত্যু।

(Prof G. L. Dickinson এর Enthanasia ভাষান্তরিত।

কুটীরে। দৃশ্য ও শ্রাব্য জগতের সংস্পর্শে আমার মনে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, ভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অভ্যাস আমার নাই। তবে আজ যে পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশের নিঃসঙ্গ কুটীরে বসিয়া আমার মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি, একঘেয়েমি নয় (?) —

কর্ত্তা, অবসর কিম্বা আত্ম দর্শনপ্রীতি তাহার কারণ নয়। এ মুখরতার অর্থ আমি এক অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি। যে নিরুদ্ধ কবাটের উদ্ঘাটন প্রার্থনা করিয়া, তাহার বধির বিরোধের দ্বারে আঘাত করিয়া এতকাল কাটিয়াছে, আজ তাহা স্বতঃই অবারিত হইতেছে। এতদিন যে রাজ্য আমার কল্পনার কাম্য ধন ছিল, যেখানে প্রবেশ-অধিকার কখনো লাভ করি নাই, আজ মুহুর্মুহু তাহারি দৃশ্যাবলি আমার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইতেছে। আমার ইন্দ্রিয়গত বোধশক্তি, আমার চিন্তা সকল, আপনাদিগের সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সুস্পষ্ট অনুভূতি এবং কল্পনার, সম্যক আলোচিত চিন্তা এবং সহজ উপলব্ধির সীমারেখা অনির্দ্দিষ্ট এবং ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বস্তু সকল চিহ্ন সমুদায়ে, ভাবসমূহ প্রত্যক্ষ বস্তুতে পরিণত; বহির্জগতের প্রত্যেক প্রত্যক্ষ আণবিক আকার, মনোরাজ্যের ভাবসমূহ; আমার হৃদয়-অনুভূত নূতন সত্যের উপমাস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এতদিন যাহা একান্ত দুরূহ ছিল, অনায়াসেই আজ তাহা বুঝিতে পারিতেছি। উপত্যকা ছাড়িয়া উপরে আসিতে আসিতে এ নূতন মনোবিকাশ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শব্দ এবং গন্ধ, বর্ণ এবং আকার, চিরদিনের মত কেবলি নিরতিশয় সুন্দর ছিলনা, তাহা মনের বিশেষ অবস্থাস্বরূপে অর্থযুক্ত হইয়াছিল। সুনীল অপরাজিতা ভঙ্গিতে সুকুমার মস্তকগুলি আনত করিতেছিল, স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্য্যমুখী প্রেমের অশ্রান্ত আগ্রহে কেবলি দিবালোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল, কঠোর পর্ব্বতগাত্রে মাধবী পুষ্পমঞ্জরী দেবতার অনন্ত আরতি উদ্যাপিত করিয়া রাখিয়াছিল, উৎস-কল্লোলে আনন্দের চিরন্তন রাগিণী উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। প্রেমের অনিবার্য্য উৎসাহে, আকাঙ্ক্ষার একান্ত আবেগে সকলেই যেন, আপন আপন ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ স্বরূপ ছাড়াইয়া উন্নততর বিশালতর আর এক অস্তিত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। প্রস্তর এবং মৃত্তিকা অন্তরের কোন অভাবের প্রেরণায় পুষ্পস্তবকমণ্ডিত বনভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, বারিরাশি বাষ্পাকুল কাতরতায় সূর্য্যালোকের মহিমার অভিমুখে যাত্রা করিতেছিল। বসুন্ধরা কোটী লক্ষ বিচিত্র সৌন্দর্য্যে কেবল মাত্র স্বর্গকেই কামনা করিতেছিল, অগণিত কণ্ঠে মুক্তির উল্লাস প্রচার করিতেছিল। এতকাল ধরিয়া যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, যাহা আশা করিয়াছিলাম, সমুদায়ই আজিকার মাহেন্দ্রক্ষণে, দেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের ন্যায় দিব্যালোকে উদ্ভাসিত। আমার জ্ঞান আজ আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, সে আকার আমাদের এই বাস্তব জগৎ। উপত্যকায় যতক্ষণ ছিলাম, এমনি ভাবগ্রহ আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু যখনি তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখনই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। সূর্য্যদেব পর্ব্বত-অন্তরালে অন্তর্ধান হইলেন, কুসুমাস্তীর্ণ উপবন, ঘনপল্লব দেবদারুব্যূহ অতিক্রম করিয়া আমার পথও অনুর্ব্বর পাষাণ দেশে পর্য্যবসিত হইল। আমি প্রথমে কঙ্করাকীর্ণ কঠিন পার্ব্বত্যপথে, পরে সঞ্চরমান তুষারনদের উপর আসিয়া পড়িলাম। উভয় পার্শ্বে পিণ্ডবৎ, বন্ধুর প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। জলপ্রপাতের গম্ভীর

পর্বতে তুষারস্তূপের ক্ষীণ স্রোতধারার মৃদু নিক্কণে, চারিদিকের নিঃশব্দতা আরো সুগভীর ও ভয়াবহ বোধ হইতেছিল। সুকুমার সান্ধ্য অরুণিমা প্রাচীমূলে মরণলুপ্ত হইল, মুহূর্তের জন্য সেই বর্ণরাগ, দিগন্ত-বিস্তৃত নীহার শুভ্রতায় সুতপ্ত স্বর্ণ জীবন সঞ্চার করিয়াছিল মাত্র, পরক্ষণেই নবোদিত অর্দ্ধচন্দ্রলেখার পার্শ্বে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহা শীতার্ত্ত, পাণ্ডুরিত, এবং মৃত্যুর ন্যায় বর্ণরহিত বোধ হইল। গৈরিক আকাশ-পথে শিশুচন্দ্র অস্তগামী তপনের অনুসরণ করিল। অব্যবহিত পরেই প্রদীপ্ত অগণ্য গ্রহনক্ষত্র স্তব্ধ তুষার লোকের প্রতি নত নেত্রের অনিমেষ দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া উদিত হইল।

ক্ষুদ্র কুটীরখানি একেবারেই শূন্য। কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ কাটিয়া আগুন করিলাম, উৎসধারা হইতে জল আনিয়া আমার রাত্রিকালের আহার্য্য রন্ধন করিলাম। এক প্রহরের অধিক হইল, তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার আরাধনা করিতেছি। হায় ব্যর্থ সাধনা, দেবীর প্রসাদ লাভ হইল না। দুর্ব্বল কুটীরদ্বার বারম্বার খুলিয়া যাইতেছে। কত প্রতিমা, ভাবের কত মূর্ত্ত চিহ্ন আমায় ঘেরিয়া ধরিয়া অর্থবিশ্লেষ প্রার্থনা করিতেছে। আকাশে নক্ষত্রের দীপ্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, জলপ্রপাতের ভীমনাদ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত। অতলস্পর্শ খাতের করাল কবলগ্রস্ত, হিমার্ত্ত শ্বেত তুষার নদে, ত্রস্ত আলোক বিদ্যুতের মত বারম্বার কম্পমান। অধিত্যকায় যেমন জীবনের বিকাশ ছিল, এই পর্ব্বত-চূড়ায় মৃত্যু রাজত্ব করিতেছে। সেই মৃত্যুর সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিতেই আমি এখানে উপস্থিত।

তাহার সম্মুখীন হইব, কৈ সে সাহস তো এখনও আমার হইল না। তাহাকে ভাবিলে মনে যে ভীতি সঞ্চার হইতেছে তাহা ভান করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। তবে জীবনের দিকেই ফিরিয়া যাই। এতদিন যে সত্য মনে আভাসের মত ছিল, এবং আজ যাহা প্রত্যক্ষ ধারণা করিয়াছি, সে নিশ্চিত জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া মনকে নিশ্চিন্ত করি।

ব্যক্তিগত জীবনের সৃজন ও উন্নতি ভিন্ন আর কিছুরি অস্তিত্ব নাই। এ জগতে সবই জীবিত; এমন কি যাহাকে অচেতন বলিয়া থাকি তাহাও জীবনে পরিপূর্ণ। এক প্রাণ কিম্বা কোটিলক্ষ প্রাণসমষ্টিদ্বারা শৈল, স্রোতস্বিনী এবং বাতাস অনুপ্রাণিত; চিন্ময়। অসংখ্য জীবনকেন্দ্র সলিলধারায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত কিম্বা কোন পরিব্যাপ্ত প্রাণশক্তি পঞ্চ ভূতের আধার একক এই স্রোতোধারাকে চিরদিন সঞ্জীবিত করিতেছে। সমুদ্র দুর্দ্দম প্রবৃত্তির নিত্য আবেগ, উৎক্ষেপ, প্রসারণ। বাতাস এবং আলোক ইচ্ছাশক্তি এবং বাসনার বিচিত্র বিকাশ। সকলে একত্রে প্রত্যেকে আপন আত্মীয় শক্তির সহিত, আপন সীমার মধ্যে, প্রেমের প্রেরণায়, ঊর্দ্ধে উন্নতির পথে মঙ্গলের তীর্থে যাত্রা করিয়াছে। সে তীর্থক্ষেত্র যে কেমন আমি তাহার প্রকৃতত্বানুসন্ধানে গভীর অভিনিবেশ ব্যয় করি নাই। এই সম্বন্ধের উৎপত্তি এবং অর্থ সম্বন্ধেও কৌতূহল পোষণ করি না। যাহা জানিয়াছি তাহাই আশ্রয় করিয়া আসিয়াছি, গতি এবং গতির কারণ; মানব আত্মায় যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছি, প্রকৃতি-রহস্যে যাহা অনুমান করিয়াছি তাহাই আমার অবলম্বন এবং নির্ভর। মানব যাহা, প্রকৃতিও তাহাই, মানব যে কি তাহা আমি সবিশেষ জানি। বৈষম্য সাম্যের, অজ্ঞান জ্ঞানের, ভীরুতা সাহসের, ঘৃণা, হৃদয়হীনতা প্রেমের অভিমুখে প্রাণপণ আগ্রহে অগ্রসর হইতেছে। মানব জীবন সামঞ্জস্যের নিয়ন্ত্রিত ধারার মত তাই সে তাহারি অভিমুখে চলিয়াছে। পতনের মাধ্যাকর্ষণ নক্ষত্রের গতিপথ, নদীর প্রবাহ তাহার অস্তিত্বে বাসনার আবেগে প্রবৃত্তিসমূহের বিদ্যমানতায় প্রকাশিত। বাস্তবকে সম্যক আয়ত্ত করাই চিরন্তন অন্বেষণের চরম একমাত্র লক্ষ্য। স্বাদ গ্রহণ, স্পর্শ লাভ, দর্শন, শ্রবণ মনন ও ধ্যান সেই রহস্য উদ্ঘাটনের নিয়ত চেষ্টা।

যে অনাত্মীয় বিষয় তাহার পথে বাধা, তাহাতেই আত্মীয়তার বন্ধন আবিষ্কার করিবার প্রয়াস, মানবের পক্ষে নিখিলের উত্তর দক্ষিণ মেরু চিররহস্যের সেই অনিমেষ নেত্রযুগলে আমি একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়াই সম্মুখে চলিয়াছি। সেই দৃষ্টির আলোকেই মানবজীবনগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। জন্মসংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়া মানব ক্রমে বুদ্ধি এবং আত্মার আলোকে আপনাকে বুঝিতে পারে। সেই আলোকে আমরা আমাদের পৃথিবী ও সেই পৃথিবীর সীমা দেখিতে পাই। জন্মমৃত্যুর দিগ্বলয় আমাদিগকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার মধ্যে শূন্যে স্থানের যে অবসর সেখানে আমরা স্বাধিকারবঞ্চিত, কেননা আমরা ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা বন্দীকৃত। এবং যবনিকা অপসারণ করিয়া যে পরিমাণ রহস্য অবারিত করিয়া দেয়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ভাগই সঙ্গোপন রাখে। আমাদের ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিক নাই, মস্তিষ্কের বোধশক্তি আছে সত্য, কিন্তু তাহাও পরিমিত, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সময়ের দ্বারা সংযত। আবরণের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করি, সেই সীমার শেষ যতদিন না স্পর্শ করি ততদিন বাড়িতে থাকি, ইহা ভিন্ন আর সমস্তই নিষ্ফলতা এবং পশ্চাৎ গতি। এই আবরণ ভেদ করাই মানব জীবনের নিয়তি, সার্থকতা,

এ মুক্তি মৃত্যুর দ্বারাই সাধিত হয়। ইহাই আমাদের অস্তিত্বের অসম্ভব সত্য, মৃত্যু যদি ধ্বংশ হয় তবে জীবন আর জীবন হইল কেমন করিয়া? আর জীবন যদি জীবনই হইল তবে মৃত্যুর অস্তিত্ব কোথায়? হয় জীবন অলীক স্বপ্ন, অস্তিত্বহীনতা, নয় ত মৃত্যুকে পরাভব করিবার একমাত্র অস্ত্রই জীবন। এই মাত্র জানিয়াছি—এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। অস্থিমেদমজ্জার এই কারাগারে আমার দ্বারা যাহা সম্ভব তাহা আমি করিয়াছি, যাহা শিখিতে পারি সে শিক্ষা আমার সমাপ্ত; বোধশক্তি যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত অনুভূতি লাভ হইয়াছে। পরিণত আত্মা চারিদিকেই প্রাচীরের বাধা অনুভব করিতেছে। এই নিয়ত সংঘর্ষে প্রাচীরে ফাটল দেখা দিয়াছে। অন্ধকারে চারিদিক হইতে অপূর্ব্ব রশ্মিলেখা খেলিয়া বেড়াইতেছে, নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া তরল সঙ্গীতধারা উৎসারিত হইতেছে। কায়া পরিবর্ত্তনের কাল সমুপস্থিত। হায় লজ্জা, আতঙ্কে আমার প্রাণ দোলায়মান। শঙ্কার নিদর্শনসমূহ এই দূরত্ব, পুঞ্জীকৃত এই হিমানী, এই অখণ্ড নির্জ্জনতা, সহানুভূতিহীন, ভাষাহীন পঞ্চভূতের অভিব্যক্তি; আমার সম্মুখে বিদ্যমান। উর্দ্ধে স্বচ্ছ আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলীর অনির্ব্বাণ অন্তহীন আলোক; কোথায় আমি যাত্রা করিয়াছি, কোন্ পথের পান্থ আমি? পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়াই আমাকে সম্মুখে চলিতে হইবে, উচ্চে অধিরোহণের সাহস আমার নাই কি?

পর্ব্বতশৃঙ্গে। এ জীবনে যত সূর্য্যোদয় দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে এমনটি আর কখনো দেখি নাই! তুষারনদের অস্তিত্ব আমি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আকাশের তারকাপুঞ্জই আমার মনে জাগ্রত ছিল। আমার বন্দীশালার ফাটলের মধ্য দিয়া তাহাদের তেজোবিকাশ উজ্জ্বল হইতে অত্যুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যেখানে সে আলোকের আনন্দ প্রবেশ লাভ করিল, সেখানে প্রাচীরের ব্যবধান লোপ হইয়া গেল। উন্মুক্ত অতীতে আমি অবাধ দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দিলাম। আমি যে আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব অতিক্রম করিয়াও সপ্রাণ তাহা বুঝিতে পারিলাম। কত বিলুপ্ত মানববংশপরম্পারর একক আমি সংহত সংস্করণ তাহা অনুভব করিলাম। আমার জীবনের উৎসমুখ হইতে যাত্রা করিলাম। বুঝিলাম আমার জীবনই সমগ্র মানব জীবনের সমষ্টি। সে কোন সুদূর যুগে আমিই, আশিয়ার নক্ষত্রালোকিত বিশাল প্রান্তরে মেষ-চারণ করিতাম। মিশরে পুরোহিতরূপে মন্দিরশিখর হইতে নক্ষত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করিতাম, গ্রীসীয় নাবিকরূপে ধ্রুব নক্ষত্রকে লক্ষ্য রাখিয়া সমুদ্র যাত্রা করিতাম, আর্কাডির পর্ব্বতনিভৃতে চন্দ্রমোহিত এণ্ডাইমিয়ন আমার বসতি ছিল। বেথলহেমে নির্দ্দেশ-তারকা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গীয় দূতদিগের অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলাম; আমিই টলেমির সহিত বাক্যালাপ এবং গ্যালিলিয়োর সহিত নীলাম্বর পর্য্যালোচনা করিয়াছিলাম। সহস্রবার মরিয়া পুনরায় সহস্রবার আমি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। সেই জন্মমৃত্যুর দ্বারাই কালের অন্ধকার রাত্রিপথে আমার অবিরত পদাঙ্ক চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। এবার কিন্তু আমি সূর্য্যোদয়ের সম্মুখ তোরণে সমাগত। নক্ষত্রশ্রেণী পাণ্ডু হইয়া লুপ্ত প্রায়, গম্ভীর মন্থর উষাকালের স্ফটিক পুষ্পদল একে একে উন্মীলিত হইতেছে, নীলকান্ত কোরকপ্রবাল অরুণিমায় প্রফুল্ল হইল। পর্ব্বত শৃঙ্গের যজ্ঞবেদিকায় সূর্য্যদেবের আবাহনের হোমাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে, মঙ্গলাচারসজ্জিত প্রাসাদে সৃষ্টির চিরন্তন বন্দনাগানের বাদ্যোদ্যমের সহিত দেবতার রথ অগ্রসর হইল। তাঁহার দিব্য মূর্ত্তি নয়নগোচর হইল না, সঙ্গীতধ্বনি শুনিলাম, অভয়ে হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি তখন সুগভীর খাত এবং সমুচ্চ আকাশের মধ্যবর্ত্তী ঢালুতুষারস্তূপে দাঁড়াইয়া। কঠিন নীহারখণ্ডসকল শৃঙ্খলের ঝঙ্কারধ্বনির মত শব্দ করিয়া অপরিমেয় তলহীন গহ্বরে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। সেই পতন শব্দে আমার স্নায়ুতন্তুশ্রেণী, আমার ইন্দ্রিয় সকল শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সেই বেদনার তীব্রতাই আমার আত্মাকে মুক্ত করিয়া দিল। শাণিত ছুরিকা যেমন দেহ হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, এ ব্যথা তেমনি করিয়া আমার অন্তরাত্মাকে দেহবিযুক্ত করিল।

পার্থিব যাহা পৃথিবীতে, ধূলিসমষ্টি ধূলিতে, ভঙ্গুর দেহ অন্ধকার গহ্বরে সমাধি লাভ করুক। আত্মার তো দ্বিজশাবকের ন্যায় উড়িবার পক্ষ আছে, সে ত উড়িতে জানে। শৈলশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে সে তাহার বাধাহীন উন্মুক্ত পক্ষ সম্পূর্ণ বিস্তার করিয়া দিল। সেইখানেই অবশেষে আমার নেত্রপথে নবোদিত সূর্য্য এবং আর এক নূতন পৃথিবী প্রতিভাত হইল। সেই আমার এতদিনের অন্য পৃথিবী কোন্‌পথে কোথায় অন্তর্ধান হইল, জানিতেও পারিলাম না। আমার সম্মুখে যে অপার জলধি বিস্তৃত, এখনও তাহা ভ্রমণসাপেক্ষ, তাহার সুদূর গভীরতা পরিমাপ প্রতীক্ষা করিতেছে। এই অতল জলরাশির মধ্য হইতে সমুচ্চ শৈলচূড়ায় অরুণাভারঞ্জিত তুষার দেখা যাইতেছে। আমার এবং ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে যে প্রাকার-ব্যবধান ছিল, ভাঙিয়া পড়িয়াছে—সূর্য্যালোকে চারিদিক পরিপ্লাবিত। সুস্পষ্টতর কলসঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাহারি উৎসাহে আমি, এবং আমার সহগামী সমগ্র সৃষ্টি অগ্রসর হইতেছে।

বহুকাল হইতে এই সঙ্গীতধারার প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি। জীবিত কালেই আর একজন অমর ছন্দে সে সঙ্গীতকে বন্দী করিয়া গিয়াছেন। যে আহ্বান তিনি শুনিয়াছিলেন আমিও আজ তাহাই শুনিলাম। তাঁহারি ভাষার দ্বারা এই সঙ্গীতের অর্থ ব্যক্ত করি।

That Light whose smile kindles the universe
That Beauty in which all things, work and move,
That Benediction which the Eclipsing curse
Of birth can quench not, that Sustaining Love
Which through the web of being blindly wove
By man and beast and Earth and sky and tree
Burns bright of dim, as Each are mirrors of
The fire for which all thirst, now beams on me,
Consuming the last clouds of cold mortality.

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ।

(১)

সিকাগো ২৬এ ফেব্রুয়ারী।

বস্তুত বাইরে যখন সমস্তই অনুকূল হয় তখনই নিজেকে সত্য রাখা শক্ত হয়ে উঠে—কারণ, সত্যের তখন কোনো পরীক্ষা হয় না—তখন মনে হয় সত্যকে না হলেও যেন চলে, আসবাব থাকলেই যথেষ্ট; এইজন্যই ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যের অধিকার দুর্লভ। টাকার প্রতি আমাদের যে অন্ধ বিশ্বাস কোনোমতেই আমাদের ছাড়তে চায় না তার জাল আমি ছিন্ন করে ফেলে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে চাই—"চাইনে কিছু"র দেশে পরমানন্দ মনে বাসা বাঁধতে চাই। এ দেশের লোকে মনের এই ভাবটাকে fatalism বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু এ fatalism নয়। যারা জীবনকে নিয়ে জুয়ো খেলে fatalism তাদেরই ধর্ম্ম—তারাই অদৃষ্টকে স্পর্শ করবার জন্য অন্ধকারে ঢেলা মারে—এ দেশে তাদের অভাব নেই। কিন্তু আমি ত অদৃষ্টকে হাৎড়ে খুঁজে বের করতে চাইনে—যে পূর্ণতা আমাকে ঘিরে আছেন ভরে আছেন তাঁকেই আমি উপলব্ধি করতে চাই—বাইরের অভাবেই যে তাঁকে বেশী করে পাওয়া যায়—রাণীর সাজসজ্জা যতই দামী হোক্ স্বামীর ঘরে গিয়ে সে সমস্ত খুলে ফেল্‌তে হয়—অন্যত্র যেমনি হোক্ কিন্তু স্বামীর কাছে এই সাজ খুলে ফেলা ত দারিদ্র্য নয়। আমাদের আশ্রমে সেই স্বামীর সঙ্গেই আমাদের কারবার—এইজন্যে সেখানে দারিদ্র্যে আমাদের লজ্জা নেই—আমরা রিক্ত একেবারে রিক্ত হয়েও পূর্ণ হব। আমাদের লজ্জা নেই, ভয় নেই, কিচ্ছু নেই—তোমরা নিরুদ্বিগ্ন হও, আনন্দিত হও এই আমি দেখ্‌তে চাই—অন্ধভাবে নয়—সমস্ত জেনে শুনে বুঝে পড়ে—চক্ষু মেলে, দুই হাত আকাশে তুলে, বক্ষ প্রসারিত করে। অভাব জিনিষটা পিছনে থাকবার জিনিষ কিন্তু আমরা তাকে সামনের দিকে ধরে তাকাই তখন তার কোনো মানে বুঝতেই পারিনে, সমস্তই ফাঁকা দেখ্‌তে থাকি—এ ঠিক যেন ছবির পিছন দিকটাকে সামনে করে দেয়ালের উপর টাঙিয়ে রাখা। কেবল দেখি ফ্যাকা ক্যান্‌ভাস—চিত্রকরের উপর বিশ্বাস একেবারে চলে যায় এবং নিজে যে এই ফাঁকা কেমন করে ভর্ত্তি করব তা ভেবে পাইনে—তখন আর কোনো উপায় দেখিনে এর উপরে পর্দ্দা ফেলে কোনমতে এই শ্রীহীনতা ঢাকতে চাই—সেও যে শূন্যকে দিয়ে শূন্য ঢাকা—যতই পর্দ্দা বাড়াই না কেন সে শূন্যতা ত কোনোমতেই যাবার নয়—কিন্তু একবার কেবল ছবির দিকটাকে পাল্‌টে ধরলেই সমস্ত ধাঁদা এক মুহূর্ত্তে ঘুচে যায়। ছোট ছেলে অন্ধকারটাকে সত্য পদার্থ বলে গ্রহণ করে বলেই তাকে ভূতের ভয় দিয়ে ভরিয়ে তোলে—আমরাও অভাবটাকে তেমনি করেই নিয়েছি, তাকে এমন ভয় দিয়ে ভরিয়েছি যে সে ভয় বাইরের দিক থেকে ঘোচানো অত্যন্ত শক্ত,—সে ভয় বস্তুত নেই এ কথা জানলেও মন সান্ত্বনা মানে না, এবং বাইরের দিক থেকে সে ভয় ঘোচাতে চেষ্টা করি—কিন্তু ঘুচবে কেন? অন্ধকারের সীমা কোথায়? তাকে ভেঙেচুরে ধুয়েমুছে ফেল্‌ব কোন্‌খানে? অথচ ভাবের দিকে কতই সহজ—একটুমাত্র ছোট আলোর শিখা। অভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন দেখি তখন সমস্ত ডালপালাসমেত একটা বটগাছকে এমন প্রকাণ্ড বাহু বলে বোধ হয় কিন্তু ভাবের দিকে একটি মাত্র ছোট বীজ। এইটেই বিধাতার কৌতুক হাস্য—তিনি অভাবটাকেই প্রকাণ্ড দৈত্যদানবের মত গড়েন, কিন্তু কার হাতে তার পরাভব ঘটান? ভীমসেনকে দিয়ে নয়—ছোট শিশু তার তূণ নিয়েই তাকে জয় করে। তাঁর না-সরোবর অতলস্পর্শ, তার কূল দেখা যায় না, তার জল মৃত্যুর মত কালো—কিন্তু তাঁর হাঁ-পদ্মটি এরই ভিতর থেকে মাথা তুলে জেগে ওঠে। সে ত প্রকাণ্ড ব্যাপার নয়, সে ত পর্ব্বত

পাহাড় নয়, সে একটি ফুল, সে আপনার ছোটর মধ্যেই সব চেয়ে বড়—তার কোনো হাঁকডাক নেই,সে হাসিমুখেই সমস্ত জয় করেছে—সে বার বার মুদে যায়, ঝ'রে পড়ে কিন্তু আবার ফুটে ওঠে, তার অমরতা মৃত্যুহীন অমরতা নয়, সে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই অমর, তার পূর্ণতা অভাবের ভিতর দিয়েই পূর্ণতা—সে যে প্রবল সে ত বল দিয়ে নয়, বলকে বিসর্জ্জন দিয়েই প্রবল। পৃথিবীতে এই অভাবের দিকেই যারা চোখ মেলে আছে তারা অহরহ ভয়েতে চিন্তাতে জর্জ্জর হয়ে রয়েছে, তারা বিষয়ের বস্তা বয়ে বয়ে এনে এই মায়া-গর্ত্ত ভরাবার জন্যে ইহজীবন গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে খেটে মরচে,—পৃথিবীতে ভাবের দিকে যাঁদের চোখ পড়েছে তাঁরাই মানুষকে চির সম্পদ চির সান্ত্বনার পথ দেখিয়েছেন—তাঁরা দুঃখকে তাড়িয়ে দিয়ে যে দুঃখ থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তা নয়—তাঁরা দুঃখকে মৃত্যুকে গ্রহণ করেই মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন—তাঁরা ছবির উল্টো পিঠটাকে মেরে খেদিয়ে দেন নাই ছবি শুদ্ধ তাকে সম্পদরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরাই মানুষকে অসঙ্কোচে অসাধ্য সাধন করবার উপদেশ দেন—তাঁরাই বলেন বিশ্বাসের জোরে পর্ব্বত টলানো যায়—তাঁরা সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছেন—তাঁরা কলসীর বাইরের তলায় জল খুঁজে খুঁজে বেড়ান না—তারা নিশ্চয় জেনেছেন কলসীর ভিতরটা জলে ভরা। যারা তাঁদের সে কথা বিশ্বাস করে না, তারা কলসীর নীচেকার বিড়ে নিংড়ে জল বের করবার চেষ্টা করছে—সেইটেকেই তারা সহজ প্রণালী মনে করে—কেন না বিড়েটাকে চোখে দেখতে পাওয়া যায়, কলসীর ভিতরটা যে ঢাকা।

(২)

সিকাগো ৩রা মার্চ্চ।

আমাদের বিদ্যালয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ডযোগে আমরা ছেলেদের মানুষ করতে চাই—কতকগুলি বিশেষ শক্তির উগ্র বিকাশ নয় কিন্তু চারিদিকের সঙ্গে চিত্তের মিলনের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। এটা যে কত বড় জিনিষ তা এদেশে এসে আমরা আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এখানে মানুষের শক্তির মূর্ত্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্ত্তি সে পরিমাণে দেখতে পাইনে। আমাদের দেশে মানুষের যেমন একটা সামাজিক জাতিভেদ আছে—এদের দেশে তেমনি মানুষের চিত্তবৃত্তির একটা জাতিভেদ দেখতে পাই। মানুষের শক্তি নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে অতিশয় মাত্রায় স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে—প্রত্যেকে আপনার সীমার মধ্যে যোগ্যতা লাভ করবার জন্যে উদ্যোগী, সীমা অতিক্রম করে যোগলাভ করার কোনো সাধনা নেই। এ রকম জাতিভেদের উপযোগিতা কিছু দিনের জন্যে ভাল। যেমন কোনো কোনো সবজির বীজ প্রথমটা টবে পুঁতে ভাল করে আজিয়ে নিতে হয়, তার পরে তাকে ক্ষেতের মধ্যে রোপণ করা কর্ত্তব্য—এও সেইরকম। শক্তিকে তার টবে পুঁতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলায় কৃষিপ্রণালীকে নিন্দা করতে পারিনে, যদি তার পরে যথা সময়ে তাকে উদার ক্ষেত্রে রোপণ করা যায়। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই দেখি নিজের সফলতার চেয়ে নিজের অভ্যাসকে সে বেশি ভাল বাসতে শেখে—এই জন্যে টবের সামগ্রীকে ক্ষেতে পোঁতবার সময় প্রত্যেকবারে মহা দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যায়। মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্ত্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরবো না? এদেশে তার অভাব এরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে—সেই অভাব মোচন করবার জন্যে এরা হাৎড়ে বেড়াচ্ছে—এদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে উদারতা আনবার জন্যে এদের দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এদের দোষ হচ্ছে এই যে এরা প্রণালী জিনিষটাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে—যা কিছু আবশ্যক সমস্তকে এরা কলে তৈরি করে নিতে চায়—সেটি হবার জো নেই। মানুষের চিত্তের গভীর কেন্দ্রস্থলে সহজ জীবনের যে অমৃত উৎস আছে এরা তাকে এখনো আমল দিতে জানে না—এইজন্যে এদের চেষ্টা কেবলি বিপুল এবং আসবাব কেবলি স্তূপাকার হয়ে উঠচে। এরা লাভকে সহজ করবার জন্যে প্রণালীকে কেবলি কঠিন করে তুলচে। তাতে একদিকে মানুষের শক্তির চর্চ্চা খুবই প্রবল হচ্ছে সন্দেহ নেই এবং সে জিনিষটাকে অবজ্ঞা করতে চাইনে—কিন্তু মানুষের শক্তি আছে অথচ উপলব্ধি নেই এও যেমন আর ডালপালায় গাছ খুব বেড়ে উঠচে—অথচ তার ফল নেই এও তেমনি। মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখীদের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোতে ফুটে উঠবে না? সেটি সৌন্দর্য্যের সুর, সেটি আনন্দের সঙ্গীত, সেটি আকাশের ও আলোকের অনির্ব্বচনীয়তার স্তবগান, সেটি বিরাট প্রাণসমুদ্রের লহরীলীলার কলস্বর—সে কারখানা ঘরের শৃঙ্গধ্বনি নয়। সুতরাং ছোট হয়েও সে বড়, কোমল হয়েও সে প্রবল—সে কেবলমাত্র চোখ মেলা, কেবলমাত্র জাগরণ, সে কুস্তি নয়, মারামারি

নয়, সে চেতনায় প্রসন্নতা। জীবনের ভিতর দিয়ে তোমরা ফুলের মত সেই জিনিষটি ফুটিয়ে তোলো—কেননা সবই যখন তৈরি হয়ে সারা হয়ে যাবে—মন্দিরের চূড়া যখন মেঘ ভেদ করে উঠ্‌বে, তখন সেই বিনা মূল্যের ফুলের অভাবেই মানুষের দেবতার পূজা হতে পারবে না, মানুষের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই একশো এক পূজার পদ্ম যখন সংগ্রহ হবে, পূজা যখন সমাধা হবে তখনি সংসার-সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করতে পারবে—কেবল অস্ত্রশস্ত্রের জোরে জয় হবে না এই কথা নিশ্চয় জেনে পৃথিবীর সমস্ত কলরবের মাঝখানে আমাদের কাজ আমরা যেন নিঃশব্দে করে যেতে পারি।

(৩)

আর্ব্বানা, ইলিনয় ১০ মার্চ্চ।

এখানে বিদ্যালয় সম্বন্ধে লোকদের মনে ঔৎসুক্য জন্মাচ্চে। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সকলেই এর বিবরণ বিশেষভাবে জানতে চেয়েছেন। কাল Atlantic monthlyর Editorএর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি—তিনি লিখ্‌ছেন—"I want to ask you whether it would not be possible for you at your leisure to write for us a general description of your school, but more especially of the philosophy of Education which underlies it. To the Atlantic's audience a discussion of this kind would be exceedingly interesting." এই পত্রিকা এদেশে সব চেয়ে প্রতিষ্ঠাশালী, সুতরাং এখানে যদি আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা হয় তা হলে সেটা শিক্ষিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেটার দ্বারা আর্থিক লাভের সম্ভাবনা কিছু হবে কি না হবে সে কথা নিশ্চয় জানিনে কিন্তু তার চেয়ে একটা বড় লাভের কথা আছে। আমাদের কাজের ক্ষেত্রকে পৃথিবীর দৃষ্টির সামনে মেলে ধরতে পারলে আপনিই তার সমস্ত কুয়াশা কেটে যেতে থাকে। আমাদের বিদ্যালয়কে যদি দেশে কালে সঙ্কীর্ণ করে জানি তাহলে আমাদের শক্তি ম্লান হয়ে থাকে আমাদের নৈবেদ্যের পরিমাণ কমে যায়। কি উপায়ে ছেলেদের পূর্ণভাবে মানুষ করে তোলা যেতে পারে এই ভাবনা আজ সমস্ত সভ্যজগতে জেগে উঠেছে—নানা জায়গায় নানা রকম পরীক্ষা হচ্চে—সমস্ত পৃথিবীর সেই ভাবনা যে আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়ের মধ্যে ভাবিত হচ্চে এবং সমস্ত পৃথিবীর সভায় এর হিসাব আমাদের দাখিল করতে হবে এই কথা মনে রাখতে পারলে চেষ্টার দীনতা ঘুচে যাবে। তাহলেই এ জিনিষটাকে আমরা একটা এণ্ট্রেন্স স্কুল মাত্র করে তুল্‌তে লজ্জা পাব। পৃথিবীতে এণ্ট্রেন্স স্কুলের অভাব অতি অল্প—মানুষের শক্তির প্রতি সে অভাবের দাবীও অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু ছেলেরা আশ্রম জননীর কোলের উপর শুয়ে বিশ্বজীবনের বিগলিত অমৃত স্তন্যধারা পান করে পূর্ণভাবে মানুষ হয়ে উঠবে এ অভাব সমস্ত পৃথিবীর অভাব—আমাদের সমস্ত জীবন দিতে না পারলে এ অভাব মোচনের আমরা আয়োজন করতে পারবো না। কিন্তু কোণের মধ্যে বসে বসে কাজ করতে করতে এ কথা আমরা কেবলি ভুলে ভুলে যাই—আমাদের সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য ধূলায় আবৃত হয়ে যায় এবং আমাদের শক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। সেই জন্যে আমাদের সেই প্রান্তরপ্রান্তের বিদ্যালয়কে বিশ্বদৃষ্টির সামনে তুলেধরতে পারলে আমরা নিজেকে নিজে সত্যভাবে দেখতে পাব—সেই দেখ্‌তে পাওয়াই আমাদের সকল ধনের চেয়ে বড় ধন। সকলের কাছে এই আমাদের প্রকাশ আমাদের গর্ব্বের বিষয় নয়, আমাদের লজ্জার বিষয়ও হতে পারে—কেবল মাত্র সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পাবার উপায় মাত্র বলে একে গণ্য করতে হবে—সত্যের দ্বারা সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগের পথ উদ্‌ঘাটন করতে হবে—ইস্কুল মাষ্টারি করে সে কাজ হবে না। আমাদের প্রত্যেককে সাধক হতে হবে, তপস্বী হতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কর্ম্ম-সাধনা।

কাজের ক'রে তুলব মোরে
ভুলব না আর আসল কথা।
কাজ ফেলে ভাই এবার আমি
ফিরব নাকো যথা তথা।
অকারণে থাকব নাকো
চেয়ে শুধু পথের পানে,
ফেলব নাকো মনটি আমার
হারিয়ে সবার হাজার টানে।
এবার মনের পালগুটিয়ে
ডুব্‌ব কাজের গভীর কূপে,
কাজের মধ্যে বিরাম যিনি
পরশ তাঁরে করব চুপে।
বাধার মধ্যে চিত্ত আমার
নিত্য রবে অবাধ হয়ে—
এই কামনা এই ভাবনা
এই সাধনাই আছি লয়ে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

অভিন্ন।

তোমারে আমারে ভিন্ন কেবা করে
তুমি আমি একাকার—
মহাসাগরের বুকের মাঝারে
বারিবিন্দু সুকুমার!

তোমারে আমারে ভিন্ন কেবা করে
আমি যে তোমাতে লীন,
নিখিলের চির পবন-উচ্ছ্বাসে
নিশ্বাস নিশিদিন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা।

বর্ণজ্ঞান।

লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি রঙগুলিকে অনেকেই চিনিয়া লইতে পারেন; কিন্তু লাল রঙ্ যখন একটু ফিকে হইয়া কমলালেবুর রঙ্ বা ম্যাজেন্টার রঙে পরিণত হয়, তখন তাহার এই নূতন অবস্থাগুলিকে চিনিয়া লওয়া বড় কঠিন হয়। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সত্যই রক্তের লোহিতত্বকে কমলালেবুর লোহিতত্ব হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারেন না। রঙ চিনিবার এই অক্ষমতাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার ব্যাধির কোটায় ফেলিতে চাহিতেছেন। কান থাকিতেও লোকে যখন মৃদু শব্দ শুনিতে না পায়, বা কোন শব্দকে বিকৃতভাবে শুনে তখন তাহাকে আমরা যেমন ব্যাধিগ্রস্ত বলি, এই ব্যাধিও কতকটা সেই প্রকার; বর্ণজ্ঞানের ব্যাধিটা কখন কখন এমন চরমে উঠে যে, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি লাল রঙকেও সবুজ রঙ্ হইতে পৃথক করিতে পারে না। এইপ্রকার বর্ণান্ধ লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে বড় অল্প নয়। জাহাজ এবং রেলের লাল ও সবুজ সিগ্‌নাল দেখিয়া যাহারা যানাদির চালনা করে তাহাদের বর্ণান্ধতা রোগ থাকিলে অনেক সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে। এইজন্য কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার সময়ে গাড়ি ও জাহাজের চালকগণকে বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, পদপ্রার্থীদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় দশ জন, অল্প বা অধিক পরিমাণে বর্ণান্ধ। আমাদের মধ্যে যে, এত রঙ্‌কাণা লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর!

কতকগুলি কাজ আছে যাহা পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতিই অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন। রোগীর সেবা, গৃহের পারিপাট্যবিধান প্রভৃতিতে পুরুষের নিপুণতা দেখা যায় না। সৌন্দর্য্যজ্ঞানের তীক্ষ্ণতাও বোধ হয় স্ত্রীজাতির আর একটা বিশেষত্ব। এই সকল বিশেষগুণের সহিত এপর্য্যন্ত বর্ণজ্ঞানের প্রবলতাটাকেও স্ত্রীজাতির বিশেষগুণ বলিয়া ধরা হইতেছিল। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে ভ্রম আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমেরিকার কলোরেডো (Colorado) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক বিষয়টি লইয়া কয়েক বৎসর নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় তিনি দেখিয়াছেন, রক্ত, পীত এবং সবুজ এই তিন বর্ণের গাঢ়তা বা তারল্য পুরুষেরা যেমন সমজাইতে পারে, স্ত্রীরা সে প্রকার পারেন না। স্ত্রীজাতির বর্ণজ্ঞানটা কেবল নীল ও বেগুণে রঙেই সীমাবদ্ধ। নীল রঙকে গাঢ় বা ফিকে করিয়া নূতন নূতন রঙ্ উদ্ভব করিতে থাকিলে, কোন্‌টা ফিকে এবং কোন্‌টা গাঢ় তাহা স্ত্রীচক্ষু অনায়াসেই বুঝিতে পারে, কিন্তু লাল, হল্‌দে ও সবুজের পরিবর্ত্তন ধরিবার চেষ্টা করিতে গেলে স্ত্রীচক্ষুকে পুরুষচক্ষুর নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

ইতর প্রাণী ও আলোক।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঈথর নামক কোন এক পদার্থের অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গমালা চক্ষুকে উত্তেজিত করিলে এবং সেই উত্তেজনা বিশেষ স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা মস্তিষ্কের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইলে প্রাণিগণ আলোক দেখিতে পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আলোক বলিয়া কোন পদার্থ নাই, আমাদের মস্তিষ্কের একটা বিশেষ অবস্থাই আমাদিগকে আলোক দেখায়। আবার ঈথরতরঙ্গমাত্রেরই ধাক্কায় আমাদের আলোক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তরঙ্গগুলি যদি বড় হয়, তবে সেগুলি শত ধাক্কা দিতে থাকিলেও আমাদের চক্ষে আলোকের উৎপত্তি করিতে পারে না। আবার তরঙ্গগুলি যদি খুব ছোট হয়, তবে তাহাদের ধাকাতেও আলোকের উৎপত্তি হয় না। মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের গঠন ইতর প্রাণীদের চক্ষু ও মস্তিষ্কের অনুরূপ নয়। কীটপতঙ্গ, জলচর-উভচর প্রভৃতি বিচিত্র প্রাণীর চক্ষু ও মস্তিষ্কের গঠনে অনেক বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। ইহা দেখিয়া জীবতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, আমরা আমাদের চক্ষু ও মস্তিষ্কের বিশেষ গুণে আলোককে যে প্রকার দেখিতেছি সম্ভবতঃ ইতর প্রাণিগণ ঠিক সে প্রকারে দেখে না। দেহের কোন অংশে চিম্‌টি কাটিলে মানুষপশু এবং কীটসরীসৃপ সকলেই যে, অল্পাধিক পরিমাণে বেদনা পায় তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা চলে, কিন্তু ঈথরের অদৃশ্য তরঙ্গমালা নানা জাতি প্রাণীর চক্ষে আঘাত দিয়া মস্তিষ্কগুলিকে যে, কি প্রকারে উত্তেজিত করে এবং সেই উত্তেজনার ফলে যে, কি প্রকার আলোক-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু বিষয়টি বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। আমরা আকাশকে যেমন নীল দেখিতেছি, এবং গাছগুলিকে যেমন সবুজ দেখিতেছি, ইতর প্রাণীরা আকাশ, গাছ এবং অপরাপর পদার্থগুলিকে কি প্রকার দেখিতেছে, তাহা জানিবার জন্য বাস্তবিকই একটা কৌতুহল হয়।

এই প্রকারে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ ইতর প্রাণীর আলোকানুভূতি-সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে একে একে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত

হইয়াছে তাহা বড়ই অদ্ভুত। ঈথরতরঙ্গের শাক্কা আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পড়িলে আলোকের জ্ঞান দেখা দেয়; দেহের অপর অংশের উপরে এই তরঙ্গের বিশেষ কোন কার্য্য দেখা যায় না। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, কীটপতঙ্গাদির সর্ব্বাঙ্গেও আলোকতরঙ্গের প্রভাব বর্ত্তমান। চক্ষুতে পড়িলে উহা আলোকের অনুভূতি জাগাইয়া দেয় এবং দেহের অপরাংশে পড়িলে সমগ্র দেহটিকে কখন আলোকের দিকে টানিয়া লইয়া যায়—বা কখন আলোক হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। আলোক জ্বালিলে বহু পতঙ্গ আলোকের দিকে ছুটিয়া আসে, এবং গায়ে উত্তাপ লাগিলেও তাহারা আলোকের কাছ ছাড়া হয় না। এই ব্যাপারটি পতঙ্গ দেহে আলোকতরঙ্গের কার্য্য। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, আলোক-তরঙ্গ পতঙ্গ দেহে পতিত হইলে তাহাতে এমন একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ করে যে, পতঙ্গগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলোকের দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। চুম্বকের কাছে লৌহ খণ্ড রাখিলে যেমন লৌহখণ্ড আপনা হইতে ছুটিয়া আসিয়া চুম্বকের গাত্রে সংলগ্ন হয়, পতঙ্গগুলিও ঠিক সেইপ্রকার কোন এক টানে পড়িয়া আলোকের নিকটবর্ত্তী হয়; পলায়নের চেষ্টা করিলেও আলোক তাহাদিগকে ছাড়িতে চাহে না।

আলোকোৎপাদক ক্ষুদ্র ঈথর তরঙ্গ মৎস্যের চক্ষুতে পড়িলে কি প্রকার কার্য্য করে, সম্প্রতি তাহার কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। ঘোর অন্ধকার ঘরে কোন বৃহৎ জলপূর্ণ পাত্রে মৎস্য রাখিয়া, নানা প্রকার রঙের আলোক একে একে পাত্রের উপরে ফেলা হইয়াছিল। লাল রঙে মৎস্যগণ একটুও সাড়া দেয় নাই;—কিন্তু সবুজ ও হলদে রঙের আলোক ফেলিবামাত্র তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে সকল ঈথরতরঙ্গ আমাদের চক্ষুতে পড়িয়া লোহিতালোকের উৎপত্তি করে, তাহা মৎস্যের চক্ষে পড়িয়া কোন আলোকেরই উৎপত্তি করে না; কেবল হরিৎ ও পীতালোকের তরঙ্গমালাতেই মৎস্যচক্ষু সাড়া দেয়।

জন্মান্ধের স্পর্শজ্ঞান।

মূক ও বধিরগণ আজন্ম শ্রবণশক্তি ও বাক্‌শক্তিহীন হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের অপর ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি বৃদ্ধি পায় কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে, ইহাদের শ্রবণশক্তির দুর্ব্বলতা প্রকৃতই অপর কতকগুলি শক্তির প্রবলতা দ্বারা পূরণ হয়। মূক ও বধিরগণের সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রায়ই প্রবল দেখা যায়, এবং চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিত কলায় তাহারা খুব নিপুণ হয়।

মূক ও বধিরদিগের ন্যায় জন্মান্ধগণ কোন বিশেষ শক্তির আধিক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে কিনা—এই বিষয়টি লইয়া সম্প্রতি অনেক পরীক্ষাদি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। আমরা জন্মান্ধগণকে প্রায়ই সঙ্গীতজ্ঞ হইতে দেখি। এই সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষমতা ইহাদের প্রকৃতিদত্ত ধর্ম্ম কি না, তাহাই প্রথমে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধিৎসুগণ ইহাকে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ জন্মান্ধই জীবিকার জন্য সঙ্গীত চর্চ্চা আরম্ভ করে, এবং দীর্ঘ চেষ্টায় তাহারা সঙ্গীতে কৃতিত্ব লাভ করে, ইহাই অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

জন্মান্ধের স্পর্শজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল, এইপ্রকার একটা কথাও শুনা গিয়া থাকে। বহু পরিচিত লোকের মধ্যে কাহাকেও অন্ধের নিকটে উপস্থিত করিলে, কেবল গায়ে হাত বুলাইয়া লোকটি যে কে, তাহা অন্ধগণ নাকি অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারে। কোন অপরিচিত স্থানে বিচরণকালে অন্ধের সম্মুখে যদি কোন অবরোধক বস্তু আসিয়া উপস্থিত হয়, অন্ধগণ চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত সেই অবরোধের অস্তিত্ব অনায়াসে বুঝিতে পারে। জন্মান্ধের এই সকল শক্তির বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে কি না, তাহা লইয়াও সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়াছেন। দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে, হাত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া জিনিস চেনা একটা অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক নয়,—এই শক্তিটা অল্পদিনের অভ্যাসেই অর্জ্জন করা যাইতে পারে। ইহা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, জন্মান্ধের স্পর্শজ্ঞানের আধিক্য প্রকৃতিদত্ত নয়; দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া মানুষ গরজে পড়িয়া স্পর্শশক্তির অধিক চর্চ্চা করে এবং ইহাতে তাহাদের স্পর্শজ্ঞানের অধিক বিকাশ হয়। সম্মুখে অবরোধক পদার্থের অস্তিত্ব বুঝা ব্যাপারেও ইহারা অন্ধদিগের মধ্যে বিশেষ শক্তির লক্ষণ দেখিতে পান নাই। অবরোধক পদার্থ সম্মুখে আসিয়া পড়িলেই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ বা পদক্ষেপের ধ্বনি তাহা হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে। চক্ষুষ্মান্ মানব এই প্রতিফলিত ধ্বনি শুনিয়াও শুনে না, কারণ চক্ষু দ্বারাই তাহারা জিনিসটার অস্তিত্ব বুঝিয়া লইতে পারে। জন্মান্ধের দৃষ্টিশক্তি নাই, কাজেই সম্মুখের প্রতিরোধক বস্তুর অস্তিত্ব তাহারা সেই প্রতিফলিত শব্দ দ্বারা বুঝিয়া লয়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

বিশ্বসংবাদ।

চীন ও জাপান।

কারেন্ট ওপিনিয়ন” নামক বিখ্যাত আমেরিকান পত্রে চীনের প্রজাতন্ত্র আরম্ভেই বিনাশ লাভ করিবে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। চীনের নব প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ইয়ান সি কাই অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়া নূতন শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার ধনাগার অর্থশূন্য, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ অবাধ্য—তিনি নিজনামে স্বাক্ষরিত যে সকল খৎ লিখিয়া দিতেছেন তাহাও বড় বড় মহাজনের দল গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। প্রাদেশিক শাসনের প্রতিনিধিগণও তাঁহাকে মান্য করিবার কোন লক্ষণ দেখাইতেছেন না। এই সকল কারণে অনেকেই মনে করিতেছেন যে চীনের নূতন শাসনতন্ত্র অধিকদিন টিঁকিতে পারিবে না—আর্থিক সঙ্কটেই তাহার মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী হইবে। কিন্তু “ন্যাশন্যাল রিভিউ” পত্রে জনৈক লেখক ‘জাপানের ভবিষ্যৎ’ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার কতক অংশ এপ্রিলের মডার্ণরিভিয়ু পত্রে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতে চীনের পরিণামকে এমন নৈরাশ্যজনক করিয়া চিত্রিত করা হয় নাই। “ন্যাশন্যাল্ রিভিউ”র লেখক বলিতেছেন “জাপানের যুদ্ধের কাল হইতে প্রায় আট হাজারের উপর চীন ছাত্র জাপান-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়াছে এবং জাপানের সামরিক বিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া তাহারা চীনকে জাপানের মত বলশালী করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যদিচ চীনে রাজতন্ত্রের ছায়ামাত্র রক্ষিত হইলে জাপান খুসী হইত, তথাপি চীনের রাষ্ট্রবিপ্লবে মোটের উপর জাপানের যথেষ্ট সহানুভূতি রহিয়াছে। চীন যে ইউরোপের বড় বড় জাতিদিগের দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হয়, জাপান ইহা কোনদিনই চায় না।

“সম্প্রতি চীন সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছে এবং এ বিষয়ে যে জাপানই তাহার সহায় হইবে তাহাও বুঝিয়াছে। চীনের যুদ্ধের জাহাজ জাপানে প্রস্তুত হইতেছে—চীন, জাপানী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। জাপানও একথা খুব করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় যে, চীনের বড় হইয়া উঠার উপর তাহার নিজের বড় হইয়া উঠার সম্পূর্ণ নির্ভর। চীন লোকবলে ও সামরিক শক্তিতে বড় হইবে, জাপান অর্থবল ও বাণিজ্যের প্রসারে বড় হইবে—তবেই একদিন প্রাচী প্রতীচীর সমকক্ষতা লাভ করিবে।”

চীনের বর্ত্তমান সঙ্কটের সুযোগ লইয়া রুশ প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ তাহার অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতেছে। রুশের চেষ্টায় মঙ্গোলিয়া চীন হইতে স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টা করিতেছে। মঙ্গোলিয়া সরিয়া গেলে চীন দুর্ব্বল হইতে পারে, কিন্তু মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতা কতটা অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহা বলা যায় না। কোথায় চীনের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ইউরোপীয় জাতিগণ তাহার সহায় হইবে তাহা নয় তাহাকে দুর্ব্বল ও পঙ্গু করিবার দিকেই তাহাদের উৎসাহ। সেইজন্যই চীনের পতনের বিলম্ব নাই এ কথা তাহারা বলিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এ কথা ভাবা দরকার যে, যে নূতন শাসনতন্ত্র চীনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সহস্র বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়াই ক্রমশ সফল হইয়া উঠিবে। ইয়ান সি কাই অক্ষম হইতেছেন বা চীনের অন্তর্বিপ্লব আজিও থামে নাই ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন করিয়া চীন “বুদ্বুদের মত ফাটিয়া বিলীন হইয়া যাইবে” এ কথা বলা এখনও সঙ্গত কি না সন্দেহ। কোন বড় অনুষ্ঠানের আরম্ভ কখনই নিতান্ত শান্ত ও সংযত ভাবে হয় না—বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া অনিবার্য্য ভাবে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন তাহার আর গত্যন্তর নাই!

বল্কান যুদ্ধ।

বল্কান যুদ্ধের পরিণাম যে কি হইবে তাহা বলা কঠিন। এড্রিয়ানোপলের পতনের সংবাদ কিছুকাল হইল জানা গিয়াছে। গত ছয় মাস ধরিয়া সেখানে যুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু তুর্কিরা এযাবৎকাল কোনমতে শত্রুদের হাতে দুর্গ ছাড়িয়া দেয় নাই। এড্রিয়ানোপল্ বহু প্রাচীন নগর—রোমানদের সময় হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে—১৩৬১ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম তুর্কিদিগের হস্তগত হয়। কন্ষ্টাণ্টিনোপলের পরে এই সহরটিই তুর্কিগণের দ্বিতীয় প্রধান সহর এখন কন্স্টাণ্টিনোপল্ তুর্কিরাজ্যের রাজধানী হইবার পূর্ব্বে এড্রিয়ানোপল্ই তাহার রাজধানী ছিল। এখান হইতেই তাহার সৈন্যদল ইউরোপের চতুর্দ্দিকে জয়লাভ করিয়া ইউরোপকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহারা রক্ষা করিতে পারিল না।

চাতালজা দুর্গশ্রেণীর দক্ষিণ অংশে বল্গার সৈন্য সম্প্রতি এক যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই দুর্গশ্রেণী অতিক্রম করিলেই বল্কান্গণ কন্ষ্টাণ্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হইবে। কিন্তু এই স্থানে বল্কান্ যুদ্ধের সবিশেষ ও সঠিক বৃত্তান্ত জানা শক্ত। চাতাল্জা দুর্গশ্রেণীর নিকটে যুদ্ধ কত দিন ধরিয়া চলিয়াছে—অথচ উভয় পক্ষে যে কত সৈন্য লড়াই করিতেছে তাহা কেহ জানে না। যে সকল খবর মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায় তাহা বিশ্বাসযোগ্য কি না সন্দেহ হয়। লণ্ডন টাইম্স্ বলেন যে চাতালজা ও কন্-

ষ্টান্টিনোপলের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষের উপর তুর্কি সৈন্য যুদ্ধে নিযুক্ত আছে।

বল্কান্ যুদ্ধে যে সকল ভীষণ হত্যাকাণ্ড ও নৃশংস অমানুষিকতার সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, তাহা পড়িলে যুদ্ধব্যাপারটা যে বাস্তবিকই কিরূপ দয়া-ধর্ম্মহীন সয়তানের উৎসব তাহা বুঝিতে পারা যায়। মুসলমানদিগের যে সকল সহর খৃষ্টান্ বল্কান্দিগের হস্তগত হইতেছে সেখানে শিশু ও স্ত্রী হত্যা ও যুবতী স্ত্রীলোকের উপর পাশব অত্যাচারের লোমহর্ষক ভয়ঙ্কর কাহিনী সকল শোনা যাইতেছে। কেবলমাত্র আমোদের জন্য শিশুসন্তানসহ মাতৃগণকে টার্গেটের মত ব্যবহার করিয়া গুলি করিয়া মারা হইতেছে। মদ্যপানে উন্মত্ত সৈন্যগণ গৃহদাহ করিয়া গ্রামের পর গ্রাম বিনষ্ট করিতেছে। বল্কান সৈন্যগণের মধ্যে কোন "ডিসিপ্লিন" নাই—ইউরোপের নানা সংবাদপত্রে সকলেই একবাক্যে এই কথা বলিতেছে।

মন্টেনিগ্রোতে এক পুরোহিতের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাঠ করিয়া ইউরোপীয় মধ্য যুগে ধর্ম্মবিদ্রোহীদিগকে পুড়াইয়া মারিবার গল্প মনে পড়ে। ধর্ম্মমতের বৈষম্য যে এরূপ বর্ব্বরোচিত দণ্ড লাভ করিতে পারে—বিংশ শতাব্দীতেও যে মানুষ আপনার চিন্তার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, ইহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা শক্ত ছিল। প্যালিক নামক এক পুরোহিত গোঁড়া ধর্ম্মমত মানে না, এইজন্য বল্কানদের নূতন অধিকৃত অ্যালব্যানিয়া প্রদেশে তাঁহাকে এবং আরও তিনশত লোককে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দাঁড় করানো হইয়াছিল। গোঁড়া ধর্ম্মমতের প্রধান ধর্ম্মযাজক সশস্ত্র সৈন্যবর্গকে দেখাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন হয় তোমরা ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন কর, নয় এই সৈন্যগণ তোমাদিগকে এই মুহূর্ত্তে নরকে প্রেরণ করিবে।"

প্যালিক ব্যতীত আর সকলেই ভয়ে স্বীকৃত হইল। প্যালিক ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন করিতে অস্বীকার করায় সৈন্যগণ তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার পাঁজরের হাড় ভাঙিয়া দিল। তখনও তাহার মত সে বদল করিতে সম্মত হইল না দেখিয়া তাহাকে সঙ্গীনের খোঁচায় হত্যা করা হইল। এই অ্যালবেনিয়াতেই সকল অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদের উপর মন্টেনিগ্রিনদের পাশব অত্যাচারের সংবাদ এই একই সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।

এনবের যে "ইয়ঙ্গ টার্ক"দের নেতা হইয়া সন্ধির প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য এবং সন্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র কাইমিল পাশাকে পদত্যাগ করাইবার জন্য ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের রাজনৈতিকগণ "ইয়ঙ্গ টার্ক"দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তুর্কির এই যুদ্ধে পরাভব অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সকলেরি ইচ্ছা ছিল যে ভালোয় ভালোয় সন্ধি স্থাপিত হইয়া যায়। কিন্তু এনবের যে সশস্ত্রে মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করিয়া কাইমিল পাশাকে বলপূর্ব্বক প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ করিতে বাধ্য করায় সন্ধির প্রস্তাব বন্ধ হইয়া গেল এবং তুর্কি যুদ্ধ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইল। ইউরোপের বিশ্বাস যে ইহাতে তুর্কির ভবিষ্যৎ কখনই মঙ্গলজনক হইবে না।

কুমেরু আবিষ্কারার্থীর মৃত্যু।

গত বৎসর ১০ই নবেম্বর তারিখে কাপ্তেন স্কটের মৃতদেহ তাঁহার তাম্বুর প্রবেশদ্বারের নিকট পাওয়া গিয়াছে। তিনি উপবিষ্ট হইয়া আছেন—পিঠটা তাঁবুর একটা দণ্ডের উপর হেলান দিয়া ডায়ারীটি মাথা এবং কাষ্ঠদণ্ডের মাঝখানে গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার তাঁবুর মধ্যে তাঁহার অপর দুইজন সঙ্গীও মৃত। একটুখানি চা ও চিনি অবশিষ্ট ছিল—কিন্তু আগুন জ্বালাইবার কোন উপকরণ ছিল না। স্কটের ডায়ারী উদ্ধার করা হইয়াছে—তাহাতে তিনি যে সকল জীবশিলা ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল অন্যান্য নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা আছে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে সেগুলি খুবই কাজে লাগিবে সন্দেহ নাই। আর এগার মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিলেই তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদিগের প্রাণ বাঁচিত—কারণ তাঁহারা ১২৮ মাইল পথ নিরাপদে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক তুষারঝটিকা নয় দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে আর পথ চলিতে দিল না—এদিকে তাঁহাদের খাদ্যসংস্থান ও অগ্নি জ্বালাইবার আয়োজন ফুরাইয়া গেল। এই ঘটনার আট মাস পরে তাঁহাদের মৃতদেহ অন্য আর দল বাহির করিয়াছে এবং তাহা প্রোথিত করিয়া সমাধির উপর তাঁহাদের তিন জনের নাম ও টেনিসনের এই ছত্রটি লিখিয়াছে—"To strive, to seek, to find, and not to yield"।—

কুমেরু আবিষ্কারার্থী অন্য দুই দলের সংবাদ।

স্কটের দল ভিন্ন আরও তিনটি দল কুমেরু আবিষ্কারার্থ বাহির হইয়া নানা বিপদে পড়িয়া নিরাপদে ফিরিতে পারিয়াছে। লেপ্টেনেন্ট ক্যাম্বেলের দল এক তুষারের নদীর মাঝখানে তাঁবু ফেলিয়া প্রায় সাড়ে ছয় মাস কাল সীলের মাংস খাইয়া এবং সীলের চর্ব্বি জ্বালাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কেন এরূপ করিতে হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই কিন্তু তাঁহারা যে নিরাপদে ও সুস্থ দেহে ফিরিয়াছেন তাহা জানা গিয়াছে। আর একদলে লেপ্টেনেন্ট ইভান্‌স্ ও তাঁহার দুই সঙ্গী ছিলেন। ইভান্‌স্ হঠাৎ "স্কার্ভি" রোগ আক্রান্ত হইয়া উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়েন। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে স্লেজে চড়াইয়া তাহা টানিয়া লইয়া চলেন—অবশেষে তাঁহারা শ্রান্ত হইয়া পড়েন তখন একজন তাঁবু ফেলিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতে থাকেন ও অপর জন সাহায্যের আশায় বাহির হইয়া পড়েন। ইঁহারাও সুস্থ দেহে ফিরিতে পারিয়াছেন। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১৮৩৪ শকের ৩রা ফাল্গুন শনিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যোড়াসাঁকোস্থ দ্বিতল গৃহে আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার যে অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্যবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অধ্যক্ষসভা

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ শরৎচন্দ্র চৌধুরী
„ নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস
„ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। আদিব্রাহ্মসমাজের আয় ও ব্যয়ের যাহাতে সমীকরণ হয়, সে বিষয় আলোচিত হইল। এই আলোচনাসূত্রে প্রকাশ পাইল যে সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক্য ১০০০৲ টাকা ব্রাহ্মসমাজের দেনা আছে।

স্থির হইল যে

(১) আগামী মাস হইতে (চৈত্র মাস) নিয়মিতরূপে প্রতি মাসে পূর্ব্বের ন্যায় আয়ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

(২) যেরূপেই হউক যথা সত্বর দেনা পরিশোধ করিবার জন্য নিয়মিত ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হইবে।

(ক) বাদকের বেতন মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা অবধারিত হইল। বর্ত্তমান অবস্থায় মাসিক ১৫৲ পোনের টাকা বেতনে বাদক নিযুক্ত রাখা অসঙ্গত বিবেচিত হইল।

(খ) সমাজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় তত্ত্ববোধিনী সভার জন্য পৃথক বাড়ী ভাড়া করা অসঙ্গত। আমাদের মতে প্রয়োজন হইলে সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে "তত্ত্ববোধিনী সভা"র অধিবেশন হইতে পারে। আগামী চৈত্র মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার জন্য পৃথক বাড়ীভাড়া দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে ধার্য্য হইল যে কলেজষ্ট্রীটে তত্ত্ববোধিনী সভা থাকিলে ভাল হয়। নগেন্দ্র বাবু বাহির হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উহা রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

(৩) ব্রাহ্মসমাজের গানের সুব্যবস্থাকল্পে আমাদের মতে প্রয়োজন হইলে বা বর্ত্তমান গায়ক শ্রীযুক্তসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে অনধিক ৫৲ টাকা (দৈনিক) পারিশ্রমিকে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মিশ্র অথবা অন্য কোন উপযুক্ত গায়ক দ্বারা সঙ্গীতকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

২। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিয়োগ বিষয় আলোচিত হইল। ইহা স্থির হইল যে—

সমাজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় বেতনভুক্ প্রচারক নিয়োগ অসম্ভব।

৩। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান বাটী বিক্রয়ের কর্ত্তব্যতা আলোচিত হইল। ইহা স্থির হইল যে—

অন্যূন ৮০০০০৲ আশি হাজার টাকা সংগ্রহ হইলে এবিষয় পুনরালোচিত হইবে।

৪। সমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগ বিষয়ে আলোচিত হইল। ইহা স্থির হইল যে—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে যথালিখিত পদে নিয়োগ করিবার জন্য ট্রষ্টীগণকে অনুরোধ করা হউক।

সভাপতি

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ মাননীয় আশুতোষ চৌধুরী

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আচার্য্য

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়
হিসাব পরীক্ষক
শ্রীসিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ধনাধ্যক্ষ
শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়

৫। আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিবার বিষয় আলোচিত হইল।

ইহা স্থির হইল যে—

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে মাসিক ১০৲ দশ টাকা পাথেয় দেওয়া যাইবে। তিনি নিতান্ত অসমর্থ না হইলে প্রত্যেক উপাসনার দিন সমাজে উপস্থিত থাকিবেন। উপাসনা ও সঙ্গীতই আদিব্রাহ্মসমাজের প্রাণ।

ট্রষ্টীগণকে অনুরোধ করা যায় যে তাঁহারা উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন।

৩ রা ফাল্গুন, ১৮৩৪ শক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

ট্রষ্টীগণ অনুমোদন করিলেন।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল।
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগ।

সভাপতি
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ মাননীয় আশুতোষ চৌধুরী
সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
আচার্য্য
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়
হিসাব পরীক্ষক
শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ধনাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়

৬ই চৈত্র, ১৮৩৪ শক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল।
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টীগণ।

আয় ব্যয়।

কাল্গুন মাস, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮৩।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩১০॥/৩
পূর্ব্বকার স্থিতি	...	৪৬৭৷৷৬
সমষ্টি	...	৭৭৮ /৯
ব্যয়	...	২৯৪।/০
স্থিত	...	৪৮৩৸৯

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদিব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৪০০৲
সমাজে ক্যাশে মজুত
৮৩৸৯
৪৮৩৸৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৬৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয় ২০০৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	২৲
" স্থকেশী দেবী	২৲
" চারুবালা দেবী	১৲
" সুহাসিনী দেবী	১৲
" হেমাঙ্গিনী দাসী	১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
	২২৬৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮৸০
পুস্তকালয়	...	৪৮।/৩
যন্ত্রালয়	...	২৭৷৷০
সমষ্টি	...	৩১০॥/৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১২৭/৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪০।/৬
পুস্তকালয়	...	৶৬
যন্ত্রালয়	...	১২৬/৯
সমষ্টি	...	২৯৪।/০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

৭০ বৎসরে পদার্পণ করিল।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সম্পাদিত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আধুনিক যুগের মাসিক পত্রিকার আদি এবং সাহিত্যসম্পদে অদ্বিতীয়। বঙ্গের অধিকাংশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যরথিগণ ইহার লেখক। সাহিত্য,বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ ও রাজনীতি, কৃষি, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিষয়ের সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধে ইহার কলেবর পূর্ণ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আজ ৭০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে জ্ঞান বিস্তার করিয়া আসিতেছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পত্রিকাখানি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্ব সাধারণের উপযোগী হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকগণ প্রীত হইয়াছেন। ইহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি এবং এ বৎসরের পত্রিকাখানি যাহাতে আরো সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারে তজ্জন্য নূতন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আমেরিকা হইতে লিখিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিমাসেই প্রকাশিত হইতেছে। ঋষিপ্রতিম দার্শনিক ও কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র ঠাকুর মহোদয়ের দার্শনিক প্রবন্ধ গীতা-পাঠ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখক মহাশয়দিগের বিবিধ প্রবন্ধ ও কবিতা ইহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে সাহিত্য-সম্পদে ও প্রবন্ধ গৌরবে অতুলনীয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আকার বর্দ্ধিত করা হইয়াছে বটে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। বরং ছাত্রগ্রাহক-দিগের জন্য মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। প্রতি মাসের ১লা তারিখেই ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ৩৷৵০ টাকা। ছাত্রগ্রাহকদিগের জন্য ২৷৵০ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ই বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সেক্রেটারী।

শোকসংবাদ।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় বিগত ১৯এ বৈশাখ রাত্রি ৯টার সময় ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ব্যাপককাল ধরিয়া ট্রষ্টীরূপে আদিব্রাহ্ম-সমাজকে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার ঘনিষ্ঠতম যোগ ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৪।

৮৩৮ সংখ্যা ১৮৩৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

বেদগান। *

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ—

একদা ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কি আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে,—"শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময় ; তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"
আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দময়, সে উদার বাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভর
অনন্ত অমৃত বার্ত্তা!

রে মৃত ভারত!
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ!
এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা! ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্ম্মধামে! দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচার বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে, উদার উচ্চ!

সমস্ত তিমির
ভেদ করি দেখিতে হইবে উচ্চশির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত ভুবনে!
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে—
"ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মত!"

১

শোন শোন সুরলোকবাসী
অমৃতের যে আছ সন্তান!
জানিয়াছি সেই অবিনাশী
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহান্।
তপনবরণ তিনি, আঁধারের পারে যিনি,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়।
নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপায়॥

২

নিত্য যিনি রয়েছেন আপনাতে করি ভর,
জান তাঁরে, জানিবার কি আছে তাঁহার পর!
যাঁহারে পাইয়া জ্ঞান-পরিতৃপ্ত ঋষিগণ,
কৃতার্থ, বিগতরাগ, নির্লিপ্ত, প্রশান্তমন।
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়।
নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপায়॥

৩

তেজোময় পুরুষ, অমৃতময়, সর্ব্বজ্ঞ, মহান্,
আকাশে আত্মায় যিনি সমভাবে সদা বিদ্যমান,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়।
নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপায়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজে—ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

অখণ্ড জীবন।*

বিশ্বকে ও মানবজীবনকে পৃথিবীর অনেক কবি ও ভক্ত পরিপূর্ণসঙ্গীতের মত করিয়া অনুভব করিয়াছেন। জগতের মধ্যে যে একটি বিরাট প্রাণ অবিরত তরঙ্গিত হইতেছে, তাহাকে নৃত্য ও গীতের ভাষায় যেমন সম্যক্ ব্যক্ত করা যায়, এমন বোধ হয় অপর কোন ভাষা কোন তত্ত্ব কিম্বা অপর কোন কলাবিগ্রহের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা যায় না। শোনা যায় ইউরোপের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের ওস্তাদ বিটোভেন বলিতেন যে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ভিতর দিয়া তিনি বিশ্বসত্তার কণ্ঠস্বর যেন শুনিতে পাইতেন—বিশ্বের অন্তরতর অশ্রুত নিগূঢ় বাণী তাঁহার শ্রুতিগম্য হইত। সেইজন্য বৈদিক কবি আকাশকে "ক্রন্দসী" "রোদসী" বলিয়াছিলেন—অনন্তকালের নিঃশব্দ গম্ভীর মহাসঙ্গীত ক্রমাগত নব নব প্রাণের বেদনায় বেদনায় ক্রন্দিত হইতেছে—সেই সকল শ্রুত ও অশ্রুত প্রাণ-ক্রন্দনের আধার ঐ আকাশ। নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে নমস্তে প্রাণ বর্ষতে নমস্তে প্রাণক্রন্দায় নমস্তে স্তনয়িত্নবে—যে প্রাণ বিদ্যুতে প্রজ্বলিত তাহাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে বিগলিত তাহাকে নমস্কার—যে প্রাণ ক্রন্দন করিতেছে তাহাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জ্জন করিতেছে তাহাকে নমস্কার—সর্ব্বংপ্রাণ এজতি—প্রাণেই সকল চরাচর কম্পিত—এই কথা তাঁহারা বলিয়াছিলেন। কেননা সেই কম্পনই যে সঙ্গীত—সঙ্গীতেই তাহার পূর্ণ পরিচয়। গুরুনানকের সেই প্রসিদ্ধ ভজন—গগনমে থাল রবি চন্দ্রদীপক বলি—তাহার মধ্যে তিনি বলিতেছেন—কৈসে আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি অনহদ শব্দ বাজন্ত ভেরী—অনাহত শব্দে ভেরী যে নিরন্তর বাজিতেছেই—সকল গগনকে পূর্ণ করিয়া সেই চরাচরব্যাপ্ত মহা সঙ্গীত অশ্রুত ছন্দে ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছেই। কবীরের 'ঝুলন' নামক যে অপূর্ব্ব কাব্য তাঁহার নবপ্রকাশিত বাক্যাবলীতে † প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতেও বিশ্বকে ও জীবনকে এক আশ্চর্য্য ঝুলনের নৃত্যময় সঙ্গীত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—"চেতন ও অচেতন দুই স্তম্ভের মধ্যে মন হিন্দোল রচনা করিয়াছে ও সেই হিন্দোলে সকল জগৎ—চন্দ্র সূর্য্য—চৌরাশী লক্ষ জীব—কোটি কল্পযুগ ঝুলিতেছে। * * প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যের তাল বাজিতেছে—মহাশূন্যে দিবারাত্রি নহবত বাদ্য চলিতেছে।" * * *

জনমমরণ বীঁহা তারী পরত হৈ
হোত আনন্দ তহঁ গগন গাজৈ।
উঠত ঝনকার তঁহ নাদ অনহদ ঘূরৈ
তিরলোকে মহলকে প্রেম বাজৈ॥

"জন্মমৃত্যুর যেখানে তাল পড়িতেছে, আনন্দ যেখানে জায়মান, গগন সেখানে দীপ্যমান। ঝঙ্কার সেখানে উঠিতেছে, অসীমের সঙ্গীত সেখানে বাজিতেছে, ত্রিলোক ধামের প্রেম সেখানে বাজিয়া উঠিতেছে।"

আর এক কবিতায় বলিতেছেন:—

নাচুরে মেরো মন মত্ত হোয়
প্রেমকো রাগ বজায় রৈন দিন
শব্দ সুনৈ সব কোই॥
রাহু কেতু নবগ্রহ নাচৈ
জম জন্ম আনন্দ হোই।

গিরি সমুন্দর ধরতী নাচৈ
লোক নাচৈ হঁসরোই॥
ছাপা তিলক লগায় বাঁস চঢ়
হো রহা জগতে ন্যারা
সহস কলা কর মন মেরো নাচৈ
রীঝৈ সিরজনহারা॥

"নৃত্য কর আমার মন, মত্ত হইয়া নৃত্য কর। প্রেমের রাগিণী দিবরাত্রি বাজাইতেছে, সবাই শুনিতেছে সেই সঙ্গীত। রাহু কেতু নবগ্রহ নৃত্য করিতেছে, জন্মমৃত্যু আনন্দে নৃত্য করিতেছে, গিরি সমুদ্র ধরিত্রী নৃত্য করিতেছে, হাস্যে ক্রন্দনে নিখিললোক নৃত্য করিতেছে। ছাপা তিলক লাগাইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া জগৎ হইতে কেন দূরে রহিয়াছ? এই দেখ সহস্র কলায় আমার মন নৃত্য করিতেছে—সৃজনকর্ত্তা তাহাতেই পরিতৃপ্ত।"

শুধু এ দেশীয় সাধক ও ভক্তগণ নন্—ইউরোপের খৃষ্টীয় সাধকদের মধ্যেও বিশ্বকে ও জীবনকে এই সঙ্গীতরূপে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া উপলব্ধি করিবার বাণী যথেষ্ট রহিয়াছে। একজন খৃষ্টীয় সাধক বলিয়াছেন—"বহির্জগতের এবং মানবজগতের দুই প্রকারের দুই বিভিন্ন সঙ্গীত। বহির্জগতের সঙ্গীত আবার ত্রিবিভক্ত—প্রথম অণুপরমাণুর, দ্বিতীয় গ্রহউপগ্রহের, তৃতীয় মহাকালের। সংখ্যা, পরিমাণ, গতি, হ্রাসবৃদ্ধি এ সমস্তের নিয়মিত তালে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত উদ্গীত হইতেছে। মনুষ্যের সঙ্গীত শরীর ও আত্মার বিচিত্র ছন্দের মধ্য দিয়া বাজিয়া উঠিতেছে।" ভক্তকবি রিচার্ড রোলের মধ্যেও এই বিশ্বগীতের রসানুভূতি কি আশ্চর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। "Mysticism" নামক এক গ্রন্থে নানা স্থানে তাঁহার বাণী লাভ করিয়া ইহাই অনুভব করিয়াছি যে আনন্দের

* বর্ষশেষের সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে পঠিত।

† শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত "কবীর" ২য় খণ্ড।

পরিপূর্ণতাকে সঙ্গীতের ভাষায় ভিন্ন ব্যক্ত করা অসম্ভব—সেইজন্য আনন্দস্বরূপের যে প্রকাশ এই বিশ্ব এবং মানবজীবন তাহাও সঙ্গীত। তিনিও বলিয়াছেন "বিশ্বকে যে আমি শুনি"—"তাঁহার প্রেম যখন দাহের মত আমার অন্তরকে অধিকার করে, তখন সকল ভাবনা গীতে রূপান্তর লাভ করে।" আবার বলিতেছেন:—"তোমরা কি দেখ নাই যে নাইটিঙ্গেল বসন্ত ঋতুতে যখন মিলনোৎসুকী হইয়া গান ধরে, তখন তাহার অশ্রান্ত সঙ্গীত সমস্ত রাত্রি আর থামে না—সমস্ত বসন্ত রাত্রি মুখরিত হইয়া উঠে। ওগো তেমনি যিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, আমি যে দীর্ঘরাত্রি তাঁহারি প্রতীক্ষায় গাহিতেছি—আমার গানেই যে তিনি আসিবেন।" "এই আত্মার সঙ্গীত ও বিশ্ব সঙ্গীত যে একই মহা অখণ্ড সঙ্গীতের অন্তর্গত।"

বিশ্বকে ও মানবজীবনকে অখণ্ড গীতের মত অনুভব করিয়াছেন ও গীতের দ্বারা সেই অনুভূতিকে ব্যক্ত করিয়াছেন—এমন এ দেশের ও বিদেশের যে সকল ভক্ত কবিদিগের নাম করা গেল, তাঁহারা সকলেই প্রাচীন। প্রাচীনকালে মনুষ্যজীবনের মধ্যে এখনকার মত এত বৈচিত্র্য, এত দ্বন্দ্ব বিরোধের সমাবেশ ছিল না—কারণ মানুষের সরল অধ্যাত্মবোধ রসবোধ তখন বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের নানা জটিল সমস্যার দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই এবং মনুষ্য সমাজের মধ্যেও নানা সমস্যা উপস্থিত হইয়া মানুষকে এখনকার মত এমন অশান্ত ও অসামঞ্জস্য করিয়া তোলে নাই। সেইজন্য তখনকার কবিগণ—বিশেষত আমাদের দেশের ভক্তকবিগণ—বিশ্বসঙ্গীত যেমন গভীরভাবে শুনিয়াছেন, মনুষ্যলোকের সঙ্গীত তেমনভাবে শোনেন নাই। ইউরোপেও হিউ অব্ সেন্ট-ভিক্টর প্রভৃতি সাধক "music of humanity" কথাটা বলিলেও সে বস্তুটি যে কি তাহা কখনই সম্যকরূপে ধারণা করেন নাই। তাহাকে কেবল শরীর ও আত্মার দ্বন্দ্বমূলক সঙ্গীতরূপেই কল্পনা করিয়াছেন অবশ্য তাহাই মধ্যযুগীয় খৃষ্টীয় সাধনার বিশেষত্ব। এ যুগের পক্ষে মনুষ্যলোককে সঙ্গীতরূপে উপলব্ধি করা কঠিন—তাহার মধ্যে কত কত বৈচিত্র্য, কত বিরোধ ও হানাহানির পালা। এ যুগে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্য-প্রকৃতির সামঞ্জস্য ঘটানো কি ভয়ঙ্কর—বিশ্বপ্রকৃতির ভাবকগণ সেখানে বারবার হার মানিয়াছেন। তাঁহারা অবাস্তব কল্পলোক রচনা করিয়া—এপিসাইকিডিয়ন রচনা করিয়া কিম্বা Return to nature প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের মন্ত্র পড়িয়া একরকমের একদেশবর্ত্তী উপর-উপর সামঞ্জস্য রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার অবাস্তব কাল্পনিকতাই তাহার প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছে। কেবল দুইচারি জন আধুনিক কবি মানবজীবনের সকল জটিলতার মধ্যে নামিয়া তাহার সকল বিরোধ ও বৈচিত্র্যকে প্রেমের এক পরিপূর্ণ রাগিণীর অন্তর্গত খণ্ড খণ্ড সুরের মত অনুভব করিয়াছেন—তাঁহাদের কাছে মানুষের সর্ব্বপ্রকারের অভিজ্ঞতার সার্থকতা আছে—এবং সমগ্র অভিপ্রায়ের মধ্যে সেই সার্থকতাকে তাঁহারা সুনিশ্চিত সাহসের সহিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যের মধ্যে বিশ্বসঙ্গীত ও মানবসঙ্গীত যে এক মহা এবং অখণ্ড সঙ্গীত, যে সঙ্গীতে "রীঝে সিরজনহারা" সৃজনকর্ত্তা স্বয়ং পরিতৃপ্ত—সেই পুরাণী বাণী সত্য ও সার্থক হইয়াছে।

তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি রবার্ট ব্রাউনিং "অ্যাবট্ ভগ্লার" নামক তাঁহার এক আশ্চর্য্য কাব্যে ইউরোপের মধ্যযুগের ঐ নামধারী এক ওস্তাদ সঙ্গীতাচার্য্যের নূতন ও বিচিত্র গীতসৃষ্টির পূর্ণ প্রেরণার ঠিক মুহূর্ত্তটিতে সেই গায়কের অন্তরের কল্পনাপ্রদীপ্ত ভাবচ্ছবিটি যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সেই গায়ক যন্ত্রের প্রত্যেক ঘাটের উপর হাত চালাইতেছেন—আর রহস্যময় গীতরাজ্য হইতে সুরের পর সুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় আসিয়া এক রমণীয় মায়াময় অলকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিতেছে—ঠিক যেমন হিব্রু পুরাণে গল্প আছে যে সলোমন এক আশ্চর্য্য মন্ত্র ঝাড়িয়া দিয়া কত কত দেবদূত কত কত অপদেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ পতঙ্গ স্বর্গ মর্ত্ত্য সকল স্থান হইতে জড় করিয়া নিমেষের মধ্যে তাঁহার প্রিয়তমা রাণীর পরিতুষ্টির জন্য এক সুরম্য প্রাসাদ রচনা করাইয়াছিলেন। ঠিক সেইরূপ এই সুরের দল পাখা উড়াইয়া কোন্ স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের অভিমুখে চলিল—একি স্বচ্ছ দর্পণোপম অদৃশ্য প্রাচীররাজি গগন ভেদ করিয়া কোন্ এক সোণার স্বপ্নমণ্ডিত মোহের মত কোন অগম নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল—তাহাদের চূড়ায় চূড়ায় অগণ্য মণিলাঞ্ছিত একি অগ্নিময় উল্কারাশি দীপ্যমান! পৃথিবী স্বর্গে উত্থিত হইয়া আপনার সীমা হারাইল—স্বর্গ পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসিল—মৃত্যুলোকের চির বিজনপুরে যাহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত তাহারা সহসা ফিরিয়া আসিল—চারিদিকে জন্মের বন্যা ছুটিল—ভূত বর্ত্তমানে, বর্ত্তমান ভবিষ্যতের দিকে তরঙ্গে তরঙ্গে অভিহত হইয়া ক্রন্দমান হইয়া বহিয়া চলিল!

গায়কের এই যে গীতের প্রেরণা ইহা বিধাতার দান। ইহা চিরস্থায়ী নহে—যেমন অকস্মাৎ আসে তেমনি অকস্মাৎই চলিয়া যায়। আর একবার গেলে তখন সেই মায়াময় অলকাপুরী ছায়ার মত মিলাইয়া গিয়া হঠাৎ এই চেতনা আনে যে ধরণীর ধূলির মধ্যেই আমরা বিলুণ্ঠিত

হইয়া পড়িয়া আছি—চারিদিকে দৈন্য ও অবসাদ, অন্ধকার ও বেদনার অন্ত নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি এই কথাই বলিতে হইবে যে এই ক্ষণিক কল্পনাদীপ্ত ভাবচ্ছবি—এই গীতোচ্ছ্বাস—অলীক মায়ামাত্র; ইহার মধ্যে সত্য নাই? কবি সেই গায়কের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—না না—সেই এক মুহূর্ত্তের ভাবচ্ছবিই সত্য, সেই মুহূর্ত্তমাত্রে অনুভূত গীতলোকই সত্য—কারণ প্রতিধ্বনি যেমন ধ্বনির অনুসরণ করে, সেইরূপ সমস্ত জীবন তাহাকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া আছে। একটা বৃত্তের টুকরামাত্র দেখিয়া যেমন তাহার পূর্ণ গোলত্বের ধারণা হয়, সেইরূপ এই অসমাপ্তি, এই অবসাদ, এই দৈন্য, এই বেদনা—সেই স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালকে একত্রকরা আনন্দসঙ্গীতের গভীরতা ও পূর্ণতাকেই বারম্বার সপ্রমাণ করিতেছে।

আমরা এখানে যাহা কিছু ইচ্ছা করিয়াছি, যাহা কিছু আশা করিয়াছি—এমন কি যাহা কিছু স্বপ্নমাত্র দেখিয়াছি—তাহার লেশতম পরিমাণও বিনষ্ট হইবার নয়। বৃত্তের বিচ্ছিন্ন অংশের মত, গানের বিক্ষিপ্ত সুরের মত, সেই সকল ভাবনা বেদনা ও অকৃতার্থতা ছড়াইয়া আছে—আমাদের ভিতরে যিনি ওস্তাদ আছেন তিনি সব জড় করিলেই—বাদে বাদে রম্য বীণ বাদে। তখনি eternity affirms the conception of an hour—অনন্তকাল একটি ক্ষণের মধ্যে তাহার যুগযুগান্তরগম্ভীর পরমবেদনাময় পরম আনন্দময় সঙ্গীত পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। তখনি—

নাচু রে মেরো মন মত্ত হোয়
প্রেমকো রাগ বজায় রৈন দিন
শবদ সুনৈ সবকোই।

"নাচো আমার মন মত্ত হইয়া নৃত্য কর। প্রেমের রাগিণী দিন রাত্রি বাজাইতেছে—সবাই শুনিতেছে সেই সঙ্গীত।"

এইরূপে জন্ম মৃত্যু, আলো অন্ধকার, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, হরণ পূরণের যমকচ্ছন্দে যে এই বিশ্বজীবনের গীতশ্লোকখানি বিরচিত—আর সেইখানে আমাদের জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই যে ব্যর্থ নয় সমস্তই যে সেই হার্ম্মণির মধ্যে স্থান করিয়া লইতেছে—ব্রাউনিংএর উদ্ধৃত কবিতাটির ইহাই সার কথা।

কিন্তু আজ বর্ষশেষের দিনে এই কথাটি লইয়া কেন এত কাঁদালো আলোচনা করিতেছি? এইবার তাহার উত্তর দিব। সে এইজন্য যে আজ পিছনে ফিরিয়া অতীতের দিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলিব না, গত বৎসরের এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী জীবনের সকল নিষ্ফলতা, ক্ষতি ও নৈরাশ্য, বিচ্ছেদবেদনা ও অপরাধের কথা ভাবিয়া ম্লান হইব না। যেমন মাল্যে গ্রথিত একটি পুষ্পের পাশাপাশি আর একটি পুষ্প সাজিয়া আসে সেইরূপ এই বৎসর আর এক নূতন বর্ষের সঙ্গে অবিচ্ছেদে গাঁথিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে—কিম্বা এক রাগিণীর মধ্যে একটি সুর যেমন আর একটি সুরের সঙ্গে সঙ্গত হয় তেমনি করিয়া সঙ্গত হইতেছে। সেই শুভলগ্নে, সেই আনন্দগ্রন্থনে—আজ কোথাও কোন বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখা দেখিব না—যদি কিছু থাকে তবে তাহা সঙ্গীতের তালের মত, সে যে সঙ্গীতকেই পরিপূর্ণতর করিয়া দিবে। অনন্তকালের নিঃশব্দ মহাসঙ্গীত যে এই নিখিল চরাচরকে ক্রমাগত জন্মে মরণে উচ্ছ্বসিত করিয়া প্রাণপ্রাণে বেদনায় বেদনায় কম্পিত ক্রন্দিত হইতেছে তাহার মধ্যে তো এই বর্ষশেষের ছেদ নাই—এ ছেদ যে এই আমাদেরই সুবিধার জন্য রচিত হইয়াছে। তা হোক; তবু ইহাকে যেন সেই সমগ্র গীতের বিচ্ছেদক রূপে অনুভব না করি এবং গত জীবনকেও যেন সম্মুখাগত জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না করি।

আজ আমরা সেই সমগ্র সঙ্গীতের রসে ক্ষণকালের জন্য অন্ততঃ এই বিশ্বজগৎ এই মানবলোক এবং আমাদের এই জীর্ণ ভগ্ন মলিন জীবনকে আপ্লুত করিয়া অখণ্ড করিয়া সুন্দর করিয়া দেখিব। আজ দেখিব জগতে সকল বিচিত্র শক্তি যেমন কল্যাণের বন্ধনে সৌন্দর্য্যের ডোরে বদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমিত গতিতে ও ওজনে তাল রক্ষা করিয়া এক অপরিমিত অসীম আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে, সেইরূপ মনুষ্যলোকের মধ্যেও সেই কল্যাণ ও সৌন্দর্য্য কত কবি কত ভাবুক কত কর্ম্মীর ভিতর দিয়া কত ভাঙাগড়াময় বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের মধ্য দিয়া কত বাঁধাবাঁধি ও নিয়মজালবেষ্টিত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ পাইতেছে। সৃষ্টিক্রিয়া কোথাও থামিয়া নাই, সে চলিয়াছেই। প্রতি মানবের ব্যক্তিগত জীবনেও সেই একই প্রক্রিয়া কাজ করিয়া চলিয়াছে। জীবনের সকল অবস্থা ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া একটি পরিণামের সূত্র অবিচ্ছিন্ন দেখা যাইতেছে—সে যে কি গাঁথিয়া চলিতেছে তাহা সেই জানে। জীবনের কোন শুভ মুহূর্ত্তে যদি তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায় তবেই আমরা ধন্য হইয়া যাই।

কবি বলিয়াছেন যে কাল হইতেছে চক্র, কুম্ভকার স্বয়ং তিনি, আর মানবজীবন মৃত্তিকারপিণ্ড। কালের চক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে—পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হইতেছে—কিন্তু এই জীবনরূপ মৃত্তিকার পিণ্ডে যত আঘাত আসিয়া পৌঁছিতেছে আমরা তাহাকে পরিবর্ত্তনমালার মত অস্থায়ী করিয়া দেখিতে পারি না—সকল আঘাতেই ক্রমাগত এই পিণ্ডটাকে নব নব আকার দান করি-

তেছে। কিন্তু কেবল কালচক্রের সেই বিচিত্র আঘাত-পরম্পরার দিকে তাকাইলেই জীবনটা কি হইয়া উঠিতেছে তাহা কি বুঝিতে পারিব? না। কুম্ভকারের অভিপ্রায়টা কি সেই কথাটাই আগে ভাবিতে হইবে। কি তাঁহার অভিপ্রায়? তিনি যে একটি পাত্র গড়িতে চান—একটি পরিপূর্ণ জীবনের পাত্র।

কেন চান্? হায় সে কি আমি বলিতে পারি? তিনি যে পিপাসিত সে কথা এ মুখে কি বলা যায়? এই আমার জীবনপাত্রেই তিনি অমৃত পান করিতে চান্—সেই জন্যইতো এই কালের চক্রের দ্বারা এত বিচিত্র আঘাত দিয়া দিয়া এত শক্ত করিয়া এই পাত্রটি তিনি গড়িতেছেন। যখন বড় বাজে বড় লাগে, তখন নীচের দিকে তাকাই আর চাকা দেখিয়া ভয়ে কাঁদি কিন্তু যদি তাঁর মুখের দিকে তাকাই তবে কি আর কান্না আসে—এ চাকা ঘোরায় কে? তিনিই যে!

এই যে পরিপূর্ণ একটি তৃষা মিটাইবার পাত্র—ইহাই জীবন। ইহাকে প্রেমিক ভক্ত কত দেশে দেশে কত রকম করিয়া বলিয়াছেন—কখন বলিয়াছেন—"আমি তোমার দীপ হে প্রেমিক, সেই দীপে তুমি আমাকে দেখিতে পাও—আমি তোমার দর্পণ হে সুন্দর, সেই দর্পণে তুমি আপনার রূপ আপনি দেখ—আমি তোমার দ্বার হে ভিখারি, সেই দ্বারে তুমি আঘাত দাও—আমি তোমার পথ হে পথিক, সেই পথে চলিতেই তোমার আনন্দ।" কিন্তু আমার মনে হয় সকলের চেয়ে বড় করিয়া বলা এই :—

"আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরবে রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।"

কারণ আর যাহাই বলি তাহাতে তাঁহার সঙ্গে জীবনের ব্যবধান থাকে—পাত্র বলিলে তাঁহার পিপাসা মিটিলেই পাত্রের কার্য্য শেষ হয়—দীপ বলিলে পথ বলিলেও সেই ব্যবধান ঘুচে না—কিন্তু গীত বলিলে আর কথা নাই—তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গীত যে একেবারে অভিন্ন অবিচ্ছিন্ন—তিনি নিজেই নিজের গান শোনেন—আর কথা নাই।

শুধু তাই নয়—গীত বলিলে জীবনের সকল বিরোধ আর বিরোধ থাকে না—তাহা এক অখণ্ড পূর্ণ রাগিণীর মধ্যে মিলিয়া যায়। যদি জীবনে অকৃতার্থ হইয়া থাকি, ইহাই সত্য হয়—তবে তাহাতে নৈরাশ্য কেন—"Why else was the pause prolonged but that singing might issue thence?" কেন এ ছেদ এত দীর্ঘ হইল যদি না পূর্ণতর সঙ্গীত তাহা হইতে উত্থিত হইবে? "Why rushed the discords in but that the harmony should be prized?" কেন এত বেসুরা ছুটিয়া আসিল যদি রাগিণীর পূর্ণতা ও সামঞ্জস্যই পুরস্কৃত না হইবে? নৈরাশ্য কোথাও নাই—নিরানন্দের কোন কারণ নাই—যদি "পড়িয়া থাকি আবার উঠিব, যদি ঘুমাইয়া থাকি নিশ্চয় জাগিব, যদি হটিয়া থাকি নিশ্চয়ই পুনরায় ভাল করিয়া যুঝিব।" "We fall to rise, are baffled to fight better, sleep to wake."

জগতে বোধ হয় আর কোথাও মৃতের শ্রাদ্ধমন্ত্র মৃত্যুকে অমৃত বলিয়া আনন্দময় বলিয়া এমন করিয়া ঘোষণা করে নাই, যেমন আমাদের ভারতবর্ষে করিয়াছে। কারণ মৃত্যু যে বিচ্ছেদ মৃত্যু যে ক্ষতি সে কথা ভোলা কি সহজ? জীবনের মধ্যেই যদি বিচ্ছেদের শক্তি এত প্রবল, তাহাকেই যদি অখণ্ড ও পূর্ণ করিয়া দেখিতে পারি না—তবে মৃত্যুকে জীবনের সঙ্গে এক ও অভিন্ন করিয়া কেমন করিয়া দেখিব? কিন্তু কি আশ্চর্য্যরূপে আমাদের দেশে আর্য্য পিতামহগণ মৃত্যুকে মধুময় আনন্দময় করিয়া জীবনেরই জয় জয়কার ঘোষণা করিলেন—জীবনকে ইহলোকে খণ্ডিত করিয়া জানিলেন না তাহাকে লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত করিয়া অনন্ত করিয়া জানিলেন। সেই মন্ত্র মৃত্যুবাসরের মন্ত্র মাত্র নহে, সেই মন্ত্র এই দিনের মন্ত্র। নববর্ষের জীবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাই আমরা সকলে মিলিয়া সেই মন্ত্রটিই গভীর ভাবে নিজ নিজ জীবনে স্বীকার করিয়া লই। এই কথা বলি—আমার কাছে বিশ্ব মধুময় হোক্ সমস্ত মধুময় হোক্ এই আমার জীবন আমার কাছে মধুময় হোক্। এই গান গাই—

"জীবনে যত পূজা হলনা সারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।"

এবং "জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে
জানিহে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।"

এবং তার পর সেই মৃত্যুমন্ত্র অথবা পূর্ণতম অক্ষয় অমৃত জীবনের মন্ত্র পাঠ করি :—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধুনক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতি মধুমাং অস্তুসূর্য্যঃ।

আজ বায়ু মধু বহন করিতেছে, নদী সিন্ধু সকল মধু ক্ষরণ করিতেছে! ওষধী বনস্পতি সকল মধুময় হোক! রাত্রি মধু হউক্ উষা মধু হউক—পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হোক্ সূর্য্য মধুমান হোক্!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কাণ্টের শিক্ষানীতি ও আশ্রমের শিক্ষার আদর্শ।

ইউরোপের বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্টের কথা কাহারও অবিদিত নাই। কনিগ্‌স্‌বার্গে অধ্যাপনা কালে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা সারগর্ভ। কাণ্টের পূর্ব্বে ফরাসী ভাবুক রুশোর "এমিলে" প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শিক্ষানীতির যুগে রুশোই প্রথম পথপ্রদর্শক। "এমিলে" গ্রন্থের প্রভাব সমগ্র ইউরোপের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এক বিপ্লবের সূচনা করে। কাণ্ট ও এই পুস্তক পাঠে ইহার আদর্শের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন।

কাণ্ট অত্যন্ত নিয়মপরায়ণ ছিলেন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিল রাখিয়া তিনি সর্ব্বদাই কাজ করিতেন। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইতেন। কোন কারণেই এক মিনিট সময় এদিক ওদিক হইতে দিতেন না। সহরের লোক কাণ্টকে রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলেই সময় বুঝিতে পারিত। কিন্তু জীবনের মধ্যে তাঁহাকেও একদিন সময় পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল—যেদিন প্রথম রুশোর এমিলে তাঁর হাতে পড়ে। এমিলে পড়িতে পড়িতে কাণ্টের সময়জ্ঞান ছিল না। নিয়মিত কর্ম্ম ওলট্ পালট্ হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় কত আগ্রহের সহিত তিনি রুশোর শিক্ষানীতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের মূলমন্ত্র ছিল 'মানবের ভ্রাতৃত্ব' (brotherhood of man)। কাণ্ট বলিয়াছেন 'man is found to live for man' মানব মানবহিতার্থেই জীবনধারণ করিয়া থাকে। বিখ্যাত শিক্ষাসংস্কারক Pestalozzi খুব জোরের সহিত এই বাণী ইয়োরোপে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, এদেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে মনুষ্যত্ব দান করিতে হইবে এবং এই মনুষ্যত্ব দানের একমাত্র উপায় শিক্ষা। দরিদ্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে ধনীগণ বাধ্য। ধন তাহাদের আত্মভোগের জন্য নহে। কাণ্টও শিক্ষার এই মূল আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁহার মত সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই দাঁড়ায় :—

(১) বর্ত্তমান যুগ অতীতের অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী।

(২) বর্ত্তমান পুরুষই ভবিষ্যৎ পুরুষের নিয়ন্তা।

(৩) অতএব প্রত্যেক বর্ত্তমান যুগকে ভবিষ্যতের পক্ষে যাহা কল্যাণ তাহা সঞ্চয় করিয়া যাইতে হইবে।

প্রত্যেক জাতিকে উপরোক্ত মূল নীতি স্মরণে রাখিয়া শিক্ষাবিধান প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, পিতামাতা শিক্ষাদানের সময় ইহা বিস্মৃত হন। কি উপায়ে সন্তান বড় হইয়া তাহার নিজের ও পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে তাহাই থাকে তাঁহাদের লক্ষ্য। সন্তান যে বর্ত্তমান কালের অঙ্গ—যে জাতির সে অন্তর্ভুক্ত সেই জাতির এমন কি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলকে সে যে সম্ভত করিয়া দিবার জন্যই আসিয়াছে—এবং সেই বৃহত্তর মঙ্গল সাধনের উপযোগী করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াসের নামই যে শিক্ষাদান—এই আদর্শ পিতামাতার মনের মধ্যে নাই।

মানবের মধ্যে দুইটি প্রকৃতি আছে। পশু প্রকৃতি ও দেব প্রকৃতি। পশু ভাবকে সংযত করিয়া ক্রমে ক্রমে মানুষের মহত্বকে জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাই কাণ্ট বলেন "Discipline changes animal nature into human nature."। পশুভাবকে বল্গা ধরিয়া সুপথে চালিত করিবার প্রধান উপায় বিচার বুদ্ধির বিকাশ। এই খানেই শিক্ষার কঠিন সমস্যা। কি উপায়ে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে? বাহির হইতে কোন চাপ দিয়া নয়। বুদ্ধি ও মনন শক্তি প্রত্যেকের নিজের নিজের ভিতর হইতে যাহাতে বিকশিত হইয়া উঠে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। শিক্ষা তাহার সেই আত্মবিকাশের সাহায্য করিবে মাত্র। বাহির হইতে কিছুই শিশুর মধ্যে চাপাইয়া বা গিলাইয়া দিবে না। কাণ্ট বলেন "All the natural endowments of mankind must be developed little by little out of man himself." "মানবের স্বাভাবিক শক্তিগুলি ধীরে ধীরে তাহার নিজের মধ্য হইতেই বিকশিত হইতে দিতে হইবে।" বস্তুতঃ "এডুকেশন" কথাটার ধাতুগত অর্থই "টানিয়া বাহির করা"—বাহির হইতে কিছু চাপাইয়া দেওয়া নয়।

শিক্ষার একটা বড় আদর্শ সম্মুখে থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার বিষয়ে জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নহে। মানব জীবনের চরম লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। আমি মনে করি সেই আদর্শই শিক্ষকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। নৌকার পক্ষে হাল ধরাটাই যথেষ্ট নহে যদি মাঝির লক্ষ্য ঠিক না থাকে।

এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মানবজীবনের লক্ষ্য যাহা সেই আদর্শ ত মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নাই। সে ত স্বপ্নমাত্র। কিন্তু পরিপূর্ণতার আদর্শ মানুষের অধিকারগম্য না হইলেও তাহাকে সম্মুখে রাখিয়াই মানবসভ্যতা তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছে। কাণ্ট বলিতেছেন

"An idea is nothing else than the conception of a perfection which has not yet been experienced"—অর্থাৎ আইডিয়া জিনিষটাই এমন একটা পূর্ণতার ধারণা যাহা এখনও অভিজ্ঞতার ভিতরে পূর্ণমাত্রায় ধরা দেয় নাই। যেমন, রাষ্ট্রসম্বন্ধে সাধারণতন্ত্রের যে আইডিয়া, তাহা কোথাও সম্পূর্ণরূপে আকার পরিগ্রহ করে নাই—অথচ সেই আইডিয়াকে সম্মুখে রাখিয়াই রাষ্ট্রতন্ত্র গঠিত হইতেছে। এবং সেই আইডিয়াটি সম্মুখে আছে বলিয়াই রাষ্ট্রতন্ত্র ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। তেমনি কোন্ আইডিয়া ছাত্রের জীবনকে বিকশিত করিবে তাহা জানা না থাকিলে কেবলমাত্র বিষয়জ্ঞান দ্বারাই আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় না। যে আদর্শকে সম্মুখে রাখিলে, শিশুর স্বভাবদত্ত বৃত্তিগুলি যথাযথরূপে প্রস্ফুটিত হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক।

আমাদের বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির লক্ষ্য কি, আমাদের দেশের অনেকে এই প্রশ্ন করেন। রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে যে শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহার পশ্চাতে কোনও দার্শনিক ভিত্তি আছে কি না? আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাগুরু এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক য়ুরোপের শিক্ষানীতিবিদ্‌গণ প্রভৃত গবেষণা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সহিত বোলপুরের শিক্ষানীতির মিল আছে কি না ক্রমে ক্রমে তাহা আলোচনা করিব।

প্রত্যেক দেশে প্রথমতঃ দুইটি সূত্র অবলম্বন করিয়া শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। যথা:—

(১) অভিভাবকের স্বার্থ।

(২) ষ্টেট্ অথবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

অভিভাবক ভাবেন এমন বিষয় শিক্ষা দিবেন যাহাতে তাঁর সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। যাহাতে তিনি সচ্ছলতায় কালযাপন করিতে পারেন।

ষ্টেট্ ভাবে প্রজার মনকে এমন শিক্ষার ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ার করিতে হইবে যাহাতে তাহার ভাব ও কর্ম্ম রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অনুকূল হয়। কিন্তু কেহই মানবজীবনের চরম লক্ষ্যটিকে দেখেন না।

"Parents care for the home, rulers for the state. Neither has as their aim the universal good and the perfection to which man is destined, and for which he has also a natural disposition."—কাণ্ট।

বিশ্বমঙ্গল এবং মানবজীবনের পরিপূর্ণতার আদর্শকে তাঁহারা দেখেন না। অথচ প্রত্যেক মানবেরই এদিকে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে। কাণ্ট খুব জোরের সহিত বলিতেছেন "The basis of a scheme of education must be cosmopolitan" "শিক্ষা-প্রণালীর ভিত্তিটি সার্ব্বজনীন হওয়া একান্ত আবশ্যক।"

বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তি এই universal good অথবা সার্ব্বজনীন মঙ্গলভাবের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সার্ব্বজনীন মঙ্গলভাবের আদর্শকে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা ভিন্ন, ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিয়া নানা রূপ দান করিয়াছে। সেইজন্য আদর্শটি সার্ব্বজনীন হইলেও, তাহার রূপটি প্রত্যেক জাতির পক্ষে স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করিলে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না—সে একটা বস্তুবিচ্ছিন্ন ভাবমাত্র স্বপ্নমাত্র হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রাচীন ভারতের এই আদর্শকে কি প্রকার শিক্ষানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা জানিতে হয়। আমাদের সেই ঋষিগণ বিশ্বের হিতকল্পে তপস্যা করিতেন—তাঁহাদের সেই তপোবনই ছিল শিক্ষাক্ষেত্র। সাম্প্রদায়িক অথবা রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শকে খর্ব্ব করেন নাই। সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বিক্ষোভ তাঁহাদের আশ্রমের অধ্যয়ন তপস্যায় ব্যাঘাত করিতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে এই আলোচনায় একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা যাইবে।

লণ্ডন। শ্রীকালীমোহন ঘোষ

গীতাপাঠ।

প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি॥ ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনাদি'র সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মগত অভিপ্রায় আমার বুদ্ধিতে আমি কিরূপ বুঝি—এই না তোমার জিজ্ঞাসা? ঐ শাস্ত্র-রহস্যটি আমি কিরূপ বুঝি তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া—তুমি আপনি কিরূপ বোঝো তাহা যদি তোমার অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে—আমি বেস্ বলিতে পারি যে, তাহার সদুত্তর পাইতে তোমার এক-মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। কেন না, আমি আমার মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি যে, তুমি যে-সমাজের একজন মাথালো গোছের কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি, এমন কি নেতা বলিলেই হয়, সে সমাজে (অর্থাৎ কৃতবিদ্য সমাজে) এ কথা না জানে এমন লোকই নাই যে, শাস্ত্রীয় রহস্যের সাংকেতিক ভাষার বাহিরের অর্থ যাহা চাসা-ভূসা শ্রেণীর অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বোধ-সুলভ তাহা স্বতন্ত্র, আর

তাহার ভিতরের অর্থ যাহা ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে "বুঝিতে পারি না" বলা নিতান্তই লজ্জার বিষয়, তাহা স্বতন্ত্র ; নারিকেলের ছোবড়া স্বতন্ত্র, আর নারিকেলের সাঁশ স্বতন্ত্র ;* দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের দেশের নিখিল পুরাণ-শাস্ত্রের এই যে একটি সুপ্রসিদ্ধ কথা—যে, অনন্ত-সর্পের সহস্র মস্তকের উপরে সসাগরা পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে, এ কথার মূলে যদি কোনো সত্য থাকে তবে তাহা এই যে, "অনন্ত সর্প" কিনা অনন্ত কাল বা অনন্ত আকাশ ; "সহস্র মস্তক" কিনা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের সমবেত আকর্ষণী শক্তি। পুরাতন গ্রীসের তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা "আপনার ল্যাজ আপনি গিলিতেছে" এইরূপ একটা সর্পমূর্ত্তি আঁকিয়া আদি-অন্ত বিহীন মহাকালের ভাব রূপকচ্ছলে জ্ঞাপন করিতেন, ইহা কাহারো অবিদিত নাই। আমার তাই এইরূপ মনে হয় যে, গণিত শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী অসীমতা-জ্ঞাপক সাংকেতিক চিহ্নটি, [∞] এই চিহ্নটি একটা ল্যাঙ্গুলগ্রাসী সর্পমূর্ত্তির অপভ্রংশ। অতএব এ বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই যে, অনন্ত-নাম-ধারী সর্প অনন্ত মহাকালের তথৈব অনন্ত মহাকাশের একটা রূপক চিত্র ছাড়া অর্থাৎ পাশ্চাত্য ভাষায় যাহাকে বলে Hieroglyphic তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। শাস্ত্রীয় ভাষার রহস্য মন্দিরে এ-যেমন একটা রূপক চিত্র দেখা গেল—জগৎপাতা ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সেইরূপ একটা রূপক চিত্র বই আর কিছুই নহে। তার সাক্ষী :—বিষ্ণুমূর্ত্তির এক হস্তে শঙ্খ—কিনা শব্দগুণের আধার আকাশ ; আর এক হস্তে চক্র—কিনা কাল-চক্র ; আর এক হস্তে গদা—কি না মৃত্যু ; আর এক হস্তে পদ্ম কি না জীবনের বিকাশ। এই রূপক চিত্রটির মর্ম্মগত অর্থ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে ; তাহা এই যে, আকাশ, কাল, এবং সমস্ত দেশ কাল জুড়িয়া জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গ-দোলা যাহা নিরন্তর দোলায়মান হইতেছে সমস্তই ঈশ্বরের হস্তের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে আমি তাই দেখিতে বলি এই যে, একটা চন্দ্রমণ্ডলের ছবি সম্মুখে রাখিয়া তদ্দৃষ্টে প্রেয়সীর মুখাকৃতি মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা, অথবা, একটা সহস্রমস্তক সর্পের ছবি সম্মুখে রাখিয়া তদ্দৃষ্টে অনন্তের ভাব মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা যেমন নিতান্তই একটা বিসদৃশ চেষ্টা, তেমনি, চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির একটা ছবি বা প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া তদ্দৃষ্টে ভগবানের সর্ব্বব্যাপী নিত্য এবং আদ্যন্তবিহীন ঐশ্বর্য্যের ভাব মনে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা নিতান্তই একটা বিসদৃশ চেষ্টা। এ সকল রূপক চিত্রের (অর্থাৎ Hieroglyphic এর) প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি, তাহা কাব্য-প্রণেতা কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও যাহা বলিবেন, আর, শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও তাহাই বলিবেন ;—করুণার্দ্রচিত্তে তোমার মুখের প্রতি চাহিয়া উভয়েই তোমাকে একবাক্যে বলিবেন—

"তোমাকে তোমার মনোমধ্যে কোনোপ্রকার ছবি আঁকিতে বলিতেছি না—বলিতেছি কেবল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে। সে যে ভাব রূপাতীত। আর, রূপাতীত বলিয়া তাহা অপরূপ-শব্দের বাচ্য।* তাহার রূপ চর্ম্ম-চক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় না, মনশ্চক্ষের সম্মুখেও গড়িয়া দাঁড় করানো যায় না ; তাই তাহাকে বলা হয় "অপরূপ"। তুমি যদি ভাবুক বা প্রেমিক হও, তবে ভাব-চক্ষে অতি সহজে তাহা দেখিতে পাইবে ; আর, তুমি যদি শুষ্ক তার্কিক হও তবে সহস্র মাথা খুঁড়িলেও তাহা দেখিতে পাইবে না—বাহিরেও না—ভিতরেও না।" কবি বলিবেন "সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য ভাবে-হৃদয়ঙ্গম-করিবার বস্তু, তা বই, তাহা চক্ষে দেখিবার বস্তুও নহে—পটে আঁকিবার বস্তুও নহে ;—লেখ্যপটেও না—চিত্তপটেও না।" শাস্ত্রকার ঋষি বলিবেন "ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অপরিসীম, এবং অনির্ব্বচনীয়! তাহা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত প্রশান্ত-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার বস্তু, তা বই তাহা লেখ্য পটে বা মানস পটে আঁকিবার বস্তু নহে।" কবি বলিবেন "সুন্দর বদনের রূপমাধুর্য্য বর্ণনাতীত বলিয়া আমরা উজ্জ্বল এবং সুন্দর বস্তু যাহা যখন হাতের কাছে পাই তাহারই সঙ্গে তাহার তুলনা দিই, কিন্তু তাহাতে আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা মেটে না ;—সুন্দর মুখের অনুপম শ্রীকে পূর্ণচন্দ্রনিভ বলিয়াও আমাদের মন তৃপ্তি মানে না, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা তাই বলি 'ইন্দু-বিনিন্দিত' বলি—'চন্দ্রকে তাহা লজ্জা দ্যায়'। মহাকবি শেক্সপিয়র জুলিয়েটের রূপ-মাধুর্য্যের কথা রোমিও'র মুখ দিয়া যাহা বাহির করাইয়াছেন—তা তো তুমি জানো! রোমিও বলিতেছে

'But soft ! What light through yonder window sreaks !
It is the east, and Juliet is the sun !—
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
That thou, her maid art far more fair than she !'

* সাঁশ শব্দ সারাংশ শব্দের অপভ্রংশ ; আর, সেইজন্য তাহার প্রকৃত [illegible] ; [illegible] "শাঁস" একরূপ নহে।

* একজন নৈয়ায়িক তর্কচূড়ামণি বলিতে পারেন—"অপরূপ রূপ" "অকথিত বাণী" "অনাহত শব্দ" এ সকল বাক্য বদতো-ব্যাঘাত দোষে দুষিত। তিনি তো তাহা বলিবেনই। কবির ব্যথা কবিই জানে!

ইহার টীকা।

পুরাতন গ্রীসের পুরাণ-শাস্ত্রে লেখে—Diana-নাম্নী দেবী চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর (সংক্ষেপে—চন্দ্রদেবীর) পরিচারিকা; আর সেই সঙ্গে এটাও লেখে যে Diana দেবী কুমারী কন্যাদিগের আদর্শভূতা চিরকুমারী। Romeo'র প্রেম-চক্ষে জুলিয়েট্ সেই Diana দেবী। Romeo তাই চন্দ্রদেবীকে বলিতেছে—'ঈর্ষান্বিত'; কেননা, চন্দ্র-দেবীর পক্ষে এটা কম লজ্জার বিষয় নহে যে, তাঁহার পরিচারিকা (অর্থাৎ Diana দেবী Juliet) তাঁহা-অপেক্ষা শত সহস্র গুণ সুন্দর।"

অতএব এটা তুমি স্থির জানিও যে, পূর্ণচন্দ্রনিভ-বিশেষণটির অর্থ পূর্ণচন্দ্রনিভ নহে;—তাহার অর্থ—অপরূপ (অর্থাৎ রূপাতীত) শ্রীসৌন্দর্য্যে শোভমান।

কাব্য-প্রণেতা কবি তোমাকে যাহা বলিবেন, তাহা বলিলাম; শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষি যাহা বলিবেন তাহাও বলিতেছি:—বলিবেন তিনি—

"উপনিষদে লেখে—

'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ"

'সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পদ, আবার, এটাও লেখে যে,—

'অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' 'তাঁহার হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন; চরণ নাই অথচ দ্রুত চলেন; চক্ষু নাই অথচ দেখেন; কর্ণ নাই অথচ শোনেন।'

উপনিষদের দুইস্থানের এই যে দুইটি শ্লোক, এ-দুইটি শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে প্রথমটির অর্থ পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে; সে অর্থ এই:—

"সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু"—কিনা তিনি সর্ব্বদর্শী; সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ" কিনা তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ; "সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু" কিনা তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; সর্ব্বত্র তাঁহার পদ কিনা তিনি সর্ব্বগত; তা বই, উহার অর্থ এ নহে যে, ঈশ্বর সত্যসত্যই সহস্র মুখ-চক্ষু-হস্তপদ-বিশিষ্ট বিকটাকার পুরুষ।

প্রশ্ন॥ যদিই বা তোমার এ কথা সত্য হয় যে, গীতাশাস্ত্রোক্ত নানা মুখচক্ষুবিশিষ্ট বিরাট্ মূর্ত্তি, তথৈব চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, একটা রূপক-প্রতিমা মাত্র; কিন্তু এটা তো আর তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, গীতাশাস্ত্রের প্রণেতা মহাঋষি গীতাগ্রন্থের প্রতি ছত্রে নরমূর্ত্তিধারী শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপাদন করিতে একটুও বচন-কৌশলের ত্রুটি করেন নাই। ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের তৃতীয় চতুর্থ শ্লোক-দুইটির সঙ্গে কখনো কি তোমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই? সে দুইটি শ্লোক এই:—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

"ন মে বিদুঃ সুরগণা প্রভবং না মহর্ষয়ঃ।
অহমাদি হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
যো মা মজ মনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

"আমার গোড়ার তত্ত্ব দেবতারাও জানেন না, মহর্ষিরাও জানেন না। দেবতাদিগেরও আমি আদিপুরুষ, মহর্ষিদিগেরও আমি আদিপুরুষ। মর্ত্ত্যের মধ্যে জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া আমাকে যে-ব্যক্তি জানে জন্মবিহীন অনাদি লোক-মহেশ্বর, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।"

উত্তর॥ কোন্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমি জন্মবিহীন"? যিনি দেবকী-গর্ভে জন্মিয়াছেন, সে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—"আমি জন্মবিহীন," তবে আমিও বলিতে পারি—আমি জন্মবিহীন, তুমিও বলিতে পার—তুমি জন্মবিহীন। অতএব যাঁহার কিছুমাত্র সম্ভবাসম্ভব বা সঙ্গতাসঙ্গত বোধ আছে—নিশ্চয়ই তিনি আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, গীতা প্রণেতা মহাঋষির মর্ম্মগত অভিপ্রায় শুধু এই যে, শ্রীকৃষ্ণের যিনি শ্রীকৃষ্ণ—আত্মার যিনি আত্মা—সর্ব্বজীবের সেই অন্তরতম আত্মা পরমাত্মা দেবকীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়া—কুন্তীর গর্ভজাত অর্জ্জুনের মধ্য দিয়া, বক্তার মধ্য দিয়া—শ্রোতার মধ্য দিয়া, গুরুর মধ্য দিয়া—শিষ্যের মধ্য দিয়া, এবং সমস্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়া—নিস্তব্ধ গম্ভীর শব্দ-হীন বাক্যে বলিতেছেন "আমি জন্মবিহীন অনাদি লোকমহেশ্বর"। এইরূপ যিনি জন্মবিহীন লোকমহেশ্বর—যাঁহার পিতা-মাতা নাই—কে তাঁহার নাম রাখিলেন "শ্রীকৃষ্ণ"? অতএব তাঁহার নাম "শ্রীকৃষ্ণ" হইতেই পারে না।

ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনা-সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মগত অভিপ্রায় আমার বুদ্ধিতে আমি যেরূপ বুঝি, তাহা তোমাকে পরিষ্কার করিয়া খুলিয়াখালিয়া বলিলাম। অধিকন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, আমার বুদ্ধিতে আমি তাহা যেরূপ বুঝি, তোমার বুদ্ধিতেও তুমি তাহা সেইরূপই বোঝো; কেবল—দশজনের মন রক্ষা করিয়া তোমার প্রযত্ন-পোষিত দালপত্যের বিষ-বৃক্ষটির মূলে জলসিঞ্চন করিবার মানসে মুখে শুধু বলিতেছ এই যে, জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায় দশ জনে যাহা বোঝে তুমিও তাহাই বোঝো, তাহার অধিক কিছুই বোঝ না। বলিতে কি—তোমার মতো সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তির মুখে অমন-ধারা একটা বিসদৃশ অজ্ঞতা'র ভান আমার কানে বিস্বাদু ঠ্যাকে এমি যে, তাহার তিক্ত আস্বাদে নাকমুখ সিঁট্‌কাইয়া আমার মন অধীরে বলিয়া ওঠে—"এ যে বিনয়ের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি!"

প্রশ্নকর্তা ॥ ঈশ্বরের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে তুমি যেমন বলিলে—কাব্যের অলঙ্কার, অত্যুক্তিকে আমি তেমনি বলি—ভাষার অলঙ্কার। প্রকৃত কথা এই যে, "আমি কিছুই বুঝি না" এটা যেমন অত্যুক্তি, "আমি সবই বুঝি" এটাও তেমনি অত্যুক্তি; দুইই সমান অত্যুক্তি। এটাও কিন্তু বলি যে, মনুষ্যের ন্যায় মর্ত্ত্য জীবের মুখে নরম-সুরের ঐ প্রথম অত্যুক্তিটি যেমন শোভা পায়, চড়া-সুরের ঐ দ্বিতীয় অত্যুক্তিটি তেমন শোভা পায় না।

উত্তর ॥ তাহা তো শোভা পায়ই না। কিন্তু ঐ চড়াসুরের অত্যুক্তিটা'র সঙ্গে কী-সূত্রে তুমি যে আমাকে জড়াইতেছ—তাহার বাষ্পও আমি বুঝিতে পারি না। তুমি যদি বলো যে, "হিমালয় পর্ব্বত তালগাছের মতো উচ্চ, আর, আমি যদি বলি যে, হিমালয় পর্ব্বতের সঙ্গে তালগাছের তুলনাই হয় না; তবে তাহাতে এরূপ বুঝায় না যে, আমি হিমালয় পর্ব্বতের আদি-অন্ত-মধ্যের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানি। তেমনি, তুমি যদি বলো "ঈশ্বর সহস্রশিরোমুখগ্রীবাবিশিষ্ট বিরাট্‌পুরুষ," আর,আমি যদি বলি যে, "অনাদ্যনন্ত ঈশ্বরের সহিত শিরোমুখবিশিষ্ট জীবের তুলনাই হয় না," তবে তাহাতে এরূপ বুঝায় না যে, আমি সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ।

প্রশ্ন ॥ তোমার প্রতি কোনো প্রকার দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নহে; আমার উদ্দেশ্য কেবল এইটি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া—যে, যে-দুই প্রকার অত্যুক্তির কথা আমি উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে যে-টি চড়াসুরের অত্যুক্তি সেইটিই কেবল নিন্দনীয়—অন্যটি (অর্থাৎ নরম সুরেরটি) মার্জ্জনীয়। এ সকল বৃথা বাদ-বিতণ্ডায় কালক্ষেপ না করিয়া তুমি যদি আমার প্রকৃত জিজ্ঞাস্য বিষয়টির একটা সদুত্তর দেও, তবে আমার বড়ই উপকার হয়। তুমি বলিতেছ যে, যে-রকমের মুক্তি গীতাশাস্ত্রের অনুমোদিত, তাহার তুমি নিগূঢ় সন্ধান জানিতে পারিয়াছ;—জানিতে পারিয়াছ যে, তাহা ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনা দূষিত সালোক্যাদি-সংজ্ঞক মুক্তিও নহে, আর, শূন্যাত্মবাদ-দূষিত কৈবল্য-সংজ্ঞক মুক্তিও নহে। তাহা যদি তুমি জানিতে পারিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাহা কোন্ রকমের মুক্তি? তাহা পদার্থটাই বা কি, আর, তাহার ভেদ-পরিচায়ক নামই বা কি?

উত্তর ॥ গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুযায়ী মুক্তির নাম যদি কিছু থাকে, তবে শাস্ত্রীয় ভাষায়—তাহার নাম জীবন্মুক্তি।

প্রশ্ন ॥ জলাশয় পানে চাহিয়া কী দেখিতেছ?

উত্তর ॥ দেখিতেছি—রহস্য মন্দ না! মার্ত্তণ্ডদেবের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া জলাশয়ের সলিলেরও যে দশা, আর, আমার শরীরেরও সেই দশা; উভয়েরই দশা সমান; সলিল এবং শরীরের মধ্যে "ডলয়োরলয়ো রভেদঃ।" অতএব আজ এই অবধিই ভাল। বর্ষার শুভাগমন হইলে জলাশয়েরও জলপূরণ হইবে, শরীর-মনের ও বল-পূরণ হইবে, আর, গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুযায়ী মুক্তির সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহারও বাকি পূরণ হইবে; পাকা আমের সঙ্গে সঙ্গে পাকা-কথার আমদানি হইবে—কিছুরই অপ্রতুল হইবে না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বকর্ম্মা।

বিশ্বকর্ম্মা তোমার কর্ম্মে
ফুটাইছ ভাব যত
ভাবনা তাহার ভাবিতে আমার
দিন হয়ে যায় গত।

আপন ভাবনা তুমিত ভাব না
তুমিত উদাসী হও,
আমি ভাবি, তুমি নিয়ত আপন
কর্ম্ম ধেয়ানে রও।

ওহে ধ্যানী তব ধ্যানের গর্ভে
ছিল এ বিশ্ব খানি,
শুধু ধ্যানবলে তারে পলে পলে
বাহিরে আনিলে টানি।

ধ্যানযোগে তব বিপুল কর্ম্ম
বায়ু সম লঘুভার,
নিশ্বাস সম ঘটিতেছে তাহে
আসা যাওয়া অনিবার।

নিখিলকর্ম্মা আমারে তোমার
ধ্যানের মন্ত্র দাও,
কর্ম্ম আমার ধ্যানের প্রসাদে
অক্ষয় করি নাও।

কর্ম্ম মাঝারে যুক্ত আমারে
রাখ হে রাত্রিদিন,
ভাবনা ভুলায়ে চিত্ত আমার
ধ্যানযোগে কর লীন।

তুমি তপস্বী মহা যশস্বী
বিরচি বিশ্বভূমি,—
নিশিদিন শত ভাব-তরঙ্গ
খেলিছে ওপদ চুমি!

শ্রীহেমলতা দেবী।

জাতি-সংঘাত। *

মানবের ইতিহাসে জাতি-সংঘাতের সমস্যা চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল বড়সভ্যতার মূলে এই সংঘাত লক্ষ্যগোচর হয়। জড়জগতে কতগুলি মূল পদার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে যে জটিল বস্তু সমষ্টি ও বিচিত্র জীবনের অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠে—তাহারি সহিত ইহার তুলনা মিলে।

ভিন্ন পরিবেষ্টনের মধ্যে এবং জীবনের ভিন্ন রূপ আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া যে সকল জাতি বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যখন সংঘাত উপস্থিত হয়, তখন তাহার ফলে নানা জটিল সামাজিক প্রতিষ্ঠান আপনিই গড়িয়া উঠে। সকল সভ্যতাই এইরূপ বিচিত্র জিনিসের সম্মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে—কেবল অসভ্য অবস্থাকেই সরল ও অবিমিশ্রিত বলা যায়।

এইরূপে জাতিগত বৈষম্যগুলিকে যখন গণ্য করিতেই হয় এবং ইহাদের পাশ কাটাইয়া চলিবার যখন কোন উপায় থাকে না, তখন বাধ্য হইয়া মানুষকে এমন একটি ঐক্যসূত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যাহা সকল বিচিত্রতাকে এক করিয়া বাঁধিতে পারিবে। সেই অন্বেষণই যে সত্যের অন্বেষণ,—বহুর মধ্যে একের অন্বেষণ, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির অন্বেষণ।

স্বভাবতই, আরম্ভে এই ঐক্যের রূপটি নিতান্ত সাদাসিধা ও স্থূল রকমের হইয়া থাকে। আদিম মানবজাতির মধ্যে প্রায়ই কোন সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে পূজা করিতে দেখা যায় এবং তাহাই সেই জাতির ঐক্যের চিহ্ন স্বরূপে ধরা হয়। প্রায়ই এই চিহ্নগুলি অতিশয় কুৎসিত ও ভীতিপ্রদ হইয়া থাকে। কারণ, বাহিরের কোন মানদণ্ডের উপর যখন মানুষের একান্ত নির্ভর, তখন তাহাকে যতদূর সম্ভব জলজ্বলে করিয়া তোলা দরকার—আর প্রাচীনকালের মানুষের কাছে ভয়ের মত এমন প্রবল জিনিস আর তো কিছুই নাই।

কিন্তু সমাজ যতই বড় হইতে থাকে এবং যুদ্ধজয় ও অন্যান্য উপায়ের দ্বারা ভিন্নাচার ও ভিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট জাতিগণ যতই মিলিত হয়, এই বিগ্রহগুলি ততই বাড়িয়া উঠে এবং এক দেবতার স্থানে বহু দেবতার সমাবেশ ঘটে। তখন জাতীয় ঐক্যবন্ধনের সহায়রূপে এই চিহ্নগুলিকে আর ব্যবহার করা চলে না—তাহাদের শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে। তখন এমন কোন জিনিস তাহাদের স্থানে আমদানী করিতে হয় যাহা কেবল ইন্দ্রিয়ের কাছেই সুগোচর নয়—যাহার মধ্যে একটি বৃহত্তর ও ব্যাপকতর ভাব আছে।

এইরূপে ক্রমেই সমস্যাটি জটিলতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ইহার সমাধানও গভীরতর এবং অধিকতর দূরগামী হইয়া উঠে। এবং মানবের ঐক্যমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি চিরন্তন ও ব্যাপক সত্যের উপর নিজ নিজ ভিত্তিস্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়। সকল ইতিহাসের মধ্যে এই একটি অভিপ্রায় কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাই—জীবনের ক্রমশ বিকাশ ও বিচিত্রতার গতিবেগের প্রেরণায় বহু জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া মানুষ সত্যকে ক্রমাগত অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে।

পৃথিবীতে এক সময় ছিল যখন গমনাগমনের সুযোগ অবাধিত না হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতি ও উপজাতি সকল অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং তাহাদের সামাজিক বিধিবিধান ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদি খুব একটি বিশিষ্ট ও তাৎস্থানিক রূপ লাভ করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং পরজাতির প্রতি অতিশয় বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। পরদেশীর লোকের সহিত কি করিয়া বনিবনাও করিয়া লইতে হয় সে শিক্ষার সুযোগ তাহাদের অল্পই ঘটিত। যদি কখনো সংঘাত বাধিত, তবে তাহারা একেবারে চরম উপায় অবলম্বন করিত—অর্থাৎ হয় পরজাতিকে ঝাড়েমূলে ধ্বংস করিয়া বিদায় করিত নয় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিত।

আজও পর্য্যন্ত নিজ নিজ জাতিগত গণ্ডীর মধ্যে অচলপ্রতিষ্ঠ ভাবে অবস্থান করিবার এই অভ্যাস মানুষের যায় নাই। পরজাতিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কার (যাহা জীবজন্তুদেরও আদিম সংস্কার) মানুষের মনের উপর আজিও চাপিয়া আছে। নিজ গণ্ডীর বাহিরে কোন জাতির নিকট সম্পর্কে আসিয়া লেশমাত্র খোঁচা খাইলেই তাহার সেই লুক্কায়িত হিংস্র স্বভাব একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়ে। অন্য জাতিকে বিচার করিবার সময়ে অথবা তাহার সহিত ব্যবহার করিবার বেলায় তাহার নিরপেক্ষ উদারতা বড় দেখা যায় না। যাহারা নিকটও নয় পরিচিতও নয়, তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে দৃষ্টিকে যে ভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তাহা মানুষ আজিও ভাল করিয়া জানিয়াছে

* নিউইয়র্ক রচেষ্টারে আহূত উদার ধর্ম্মমতাবলম্বিগণের মহা-সভায় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত এবং এপ্রিলের মডার্ণরিভিয়ু পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ।

বলিয়া মনে হয় না। নিজের ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠতা ও স্বকীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য সে প্রাণপণ করে—এ কথা স্বীকার করিতে পারে না যে, সত্য কেবল সত্য বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল বাহ্য প্রভেদের উপরেই অধিক দৃষ্টি দিতে তাহার ঝোঁক দেখা যায়—যে অন্তরতম সামঞ্জস্যে সকল প্রভেদ মিলিয়া যায় সে দিকে তাহার চোখ পড়ে না।

অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে "ঘোরো" শিক্ষার বর্দ্ধিত হইবার ফলেই এই সকল ঘটিয়াছে—বিশ্বের মানুষ হইবার পক্ষে মানুষ উপযুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু দীর্ঘকালতো এ অবস্থা চলিতে পারে না—তাই বিজ্ঞান ও শিল্পবাণিজ্যের বিস্তারের এই নবযুগে আজ মানুষ মানুষের যেরূপ নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে এরূপ আর কোন কালেই আসে নাই। সেই জন্যই মানুষকে আজ ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সে এই জাতি-সংঘাতের সমস্যা।

ইতিহাসের বৃহত্তর প্রসারের ভিতর দিয়া মানবের গভীরতর অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহার মীমাংসা হইবে—সেই অপেক্ষায় এই যুগ যুগব্যাপী প্রশ্নটি বসিয়া আছে। ইহাতো কেবলমাত্র বুদ্ধিগত বা অনুভূতিগত বিষয় নহে। পূর্ব্বকালে আমরা এমন সকল মহাপুরুষ লাভ করিয়াছিলাম যাঁহারা সকল মানবের সাম্যের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন, এমন দর্শন ও সাহিত্য পাইয়াছিলাম যাহা জাতিগত সংস্কার ও আচারের গণ্ডীর বাহিরে আমাদের দৃষ্টিকে বৃহত্তর সত্যের মধ্যে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই জাতিসমস্যা তাহার এই প্রভূত জটিলতা লইয়া কখনই আমাদের সম্মুখে এমন করিয়া উপস্থিত হয় নাই—ইহার সহিত আমাদের জীবনের এমন করিয়া যোগ ঘটে নাই। কচি মেয়ে যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে সেইরূপ ভাবেই মানবের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতির ভাব লইয়া মনুষ্য সাধারণ এতদিন কাল পর্য্যন্ত খেলা করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য মনুষ্যহৃদয়ের মধ্যে যে ভাব নিহিত হইয়া আছে তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের ভিতর দিয়া ইহা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে নাই। এখন সেই ক্রীড়ার সময় চলিয়া গেছে, যাহা কেবলমাত্র অনুভবের বিষয় ছিল তাহা এখন গুরুতর দায়িত্বের আধার হইয়া জীবনের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে।

আমার মনে হয়, সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে ভারতবর্ষেই এই জাতি-সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়া দেখা দিয়াছিল। বহুযুগ ধরিয়া ভারতবর্ষকে জাতিবৈচিত্র্যের অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক কঠিন গ্রন্থিবিশিষ্ট জট একটু একটু করিয়া উন্মোচন করিবার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপে যে সকল জাতি জড় হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে খুব বেশী বৈষম্য ছিল না—তাহাদের অধিকাংশই একই মূলজাতি হইতে উৎপন্ন ছিল। সুতরাং যদিচ ইউরোপে ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের মধ্যে কলহ বিবাদ যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল, কিন্তু রক্তের ও মুখাবয়বের ভেদে যে জাতি-বিদ্বেষ জন্মায়, তাহা সেখানে কদাচ ছিল না। ইংলণ্ডে নর্ম্যান ও স্যাক্সনদিগের মিলন ঘটিতে অনেক বিলম্ব হয় নাই। কেবল বর্ণে এবং শারীরিক গঠনে নয়—জীবনের আদর্শেও পাশ্চাত্যজাতিগণ পরস্পরের এত নিকটতর যে বস্তুত তাহারা সকলে মিলিয়া একমনপ্রাণ হইয়া তাহাদের সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এমনটি ঘটে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্ভকালেই শুভ্রকায় আর্য্যগণের সহিত কৃষ্ণকায় এবং অসভ্য আদিম অধিবাসিগণের সংগ্রাম বাধিয়াছিল। তারপর এইখানে দ্রাবিড়জাতি ছিল এবং তাহাদের এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ছিল। তাহাদের দেবদেবী পূজাপদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি আর্য্যগণের পূজাপদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ছিল। একেবারে বর্ব্বর অবস্থার চেয়ে এইরূপ সভ্য অবস্থার বৈষম্য অনেক বেশি প্রবল তাহাতে সন্দেহ নাই।

শীতপ্রধান দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে জীবন সংগ্রাম অত্যুগ্র নহে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবনযাত্রার উপকরণ অপেক্ষাকৃত সরল এবং প্রকৃতি মাতাও তাঁহার সম্পদ বিতরণে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন না—সুতরাং এই সকল দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের মধ্যে বিরোধবিবাদ নব নব উত্তেজনার অভাবে শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। সেইজন্য ভারতবর্ষে খুব কঠিন সংগ্রামের পরে ভিন্নবর্ণ, ভিন্নাচারী, ভিন্ন মুখাবয়ব ও ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট জাতিগণ পাশাপাশি নির্ব্বিবাদে বসবাস করিয়াছিল দেখা যায়। কিন্তু মানুষ তো আর জড়বস্তু নয়, সে প্রাণবান্ পদার্থ—সুতরাং এই নানা বিভিন্ন জাতির একত্রাবস্থান ভারতবর্ষের পক্ষে এক চিরন্তন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অথচ সকল প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও এই বৈচিত্র্যই এখানকার মানুষের মনকে নানার মধ্যে এককে বাহির করিবার দিকে উদ্বোধিত করিয়াছিল। এই কথা তাহাকে জানাইয়াছিল যে বিগ্রহ অথবা বাহ্য আচারের বৈষম্য যতই হউক না কেন, যে ভগবানকে উপলব্ধি করিবার ইহারা সহায় তিনি এক বই দুই নন—এবং তাঁহাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করা মানে সকল ভূতের অন্তরাত্মারূপে তাঁহাকে জানা।

বৈষম্যগুলি যখন অত্যন্ত উৎকট ও উগ্র হয়, তখন

মানুষ কেমন করিয়া তাহাদিগকে চরম বলিয়া স্বীকার করিবে। সুতরাং হয় সে রক্তের দ্বারা সকল অনৈক্যকে মুছিয়া শেষ করিয়া ফেলে, নয় জবরদস্তির দ্বারা একটা উপর-উপর স্থূল সাম্যে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখে—কিম্বা সকলের চেয়ে যে বৃহৎ সত্য যাহার মধ্যে সকল বিচ্ছেদের অবসান তাহাকেই আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করে।

ভারতবর্ষ এই তিন প্রকার মীমাংসার মধ্যে শেষটি গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জন্য তাহার যুগযুগব্যাপী সকল রাষ্ট্রীয় অবস্থাবিপর্য্যয় উত্থান পতনের মধ্যে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি অপরাজিত বেগে কাজ করিয়া চলিয়াছে—যদিচ তাহার সহগামিনী গ্রীস ও রোমের সভ্যতা বহু পূর্ব্বেই তাহাদের জীবনী-শক্তিকে নিঃশেষ করিয়া বসিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত সেই তাহার অন্তরাত্মার অন্তর্নিহিত গৌরব ম্লান হয় নাই। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও একথা বলিতেছি না যে জাতি-বৈষম্যের জন্য যে সকল বাধাবিপত্তি অবশ্যম্ভাবী তাহা ভারতবর্ষে বিদ্যমান নাই। উল্টা বরং হইয়াছে এই যে নব নব বৈষম্য আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে, এবং নূতন নূতন জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে জগতের সকল বড় বড় ধর্ম্ম এই ভারতবর্ষের মাটীর মধ্যেই নিজ নিজ মূল নিখাত করিয়াছে। এই বিপুল বৈচিত্র্যকে সামঞ্জস্যে বাঁধিতে গিয়া ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ ও অভিপ্রায় যুগে যুগে নানা ভাঙা গড়া, নানা সংকোচ ও প্রসারণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তাহার সর্ব্বশেষ প্রয়াস হইয়াছে—বিধিনিষেধের কঠিন গণ্ডী রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে গোলযোগ ও সংঘাত নিবারণ করিবার উদ্যোগ।

কিন্তু এ প্রকারের অভাবাত্মক আয়োজন তো দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইতে পারে না—মানবসমাজে যান্ত্রিক বন্দোবস্ত কখনই ভালমত কাজ করিতে পারে না। যদি দৈবক্রমে এমন কতকগুলি জাতি এক জায়গায় এক-ত্রিত হয় যাহাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র, যাহারা একরূপ আচারের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠে নাই; তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রেমমূলক বিস্তৃত ঐক্যের ভিত্তি তাহারা আবিষ্কার না করে, ততক্ষণ তাহাদের শান্তি হইতেই পারে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষে এই ভাবাত্মক ঐক্যমূলক আধ্যাত্মিক আদর্শ আছে—সুপ্ত হইলেও তাহা প্রাণহীন হয় নাই—তাহা ভিতরের ঐক্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া বাহিরের সকল অনৈক্যকে মানিয়া লইবার শক্তি রাখে। আমি নিশ্চিতরূপে অনুভব করি যে ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান ও প্রেমের কারখানাঘরে সেই সোনার চাবিটি তৈরি হইয়াছে যাহা একদিন অর্গলবদ্ধ সকল দ্বার উন্মোচন করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবহিত ও বিচ্ছিন্ন জাতিসকলকে প্রেমের এক মহা নিমন্ত্রণে সম্মিলিত করিবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুদূরকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত এখানকার সকল মহাপুরুষ এই কাজই তো করিয়া আসিতেছেন। ভগবান বুদ্ধ যে বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অনেক পূর্ব্বের আর এক ধর্ম্মান্দোলনের ফলমাত্র। নানা বিগ্রহ অনুষ্ঠান ও ব্যক্তি-গত সংস্কারের বিচিত্রতার ভিতরে সেই ধর্ম্মান্দোলন আধ্যাত্মিক সত্যের এক পরম ঐক্যের মধ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

মুসলমান-শাসন ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কেবল যে নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা এদেশে আসিল তাহা নহে, ধর্ম্ম ও সামাজিক প্রথাতেও নূতন নূতন ভাব প্রবল ভাবে এদেশের জনগণের মনোমধ্যে উপস্থিত হইল। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে ইহা বিরুদ্ধ ও বিদ্বেষী কোন আন্দো-লনের সৃষ্টি করিল না। বরং এই সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল ধর্ম্মবীর মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে এই নূতন ভাবকে এক গভীরতর সমন্বয়ে অন্বিত করিয়াছিলেন। এই মধ্য যুগের আন্দোলন সকলের মধ্যে এদেশের জন-সমূহের নিকটে বারম্বার এই আহ্বানই আনিয়াছিল যে তাহারা যেন জাতিধর্ম্মের সকল বিরোধ ভুলিয়া নারায়ণের প্রেমে সম্মিলিত সকল নরকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করা মানুষের সর্ব্বোচ্চ অধিকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়।

আবার ইংরাজ আগমনে খৃষ্টীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আধুনিক যুগে সেই একই ব্যাপার পুনরায় ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন কিসের আন্দোলন? তাহা পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে ধর্ম্মের বন্ধনে মিলাইবার উদ্যোগ—উপনিষদের গভীর অধ্যাত্ম জ্ঞানের উদার ভিত্তির উপর সেই মহৎ মিলনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ। পুনরায় এদেশবাসীর নিকটে বাহ্য আচারের প্রথা ও জাতিভেদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবানের নামে সকল মানুষকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিবার আহ্বান আসিয়াছে।

জগতের আর কোন দেশেই ভারতবর্ষের মত সকল দিক দিয়া বিভিন্ন জাতিসম্মিলন এমন বিপুল আকারে ঘটে নাই। সেইজন্য 'নেশন' মাত্র গড়িয়া এই সমস্যার একটা সহজ মীমাংসা করা ভারতবর্ষের দ্বারা সম্ভাবনীয় হয় নাই। নিয়ত বিরোধশীল এত বৈচিত্র্যকে 'নেশন' কেমন করিয়া সামঞ্জস্য দান করিবে—সুতরাং মানুষের সর্ব্বোচ্চ শক্তি, তাহার অধ্যাত্মশক্তির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই—সকল বিরোধের সেতু ঈশ্বরের শরণ

লইতেই হইবে। বরাবর ভারতবর্ষে তাই একদিকে প্রাণহীন আচার বিচারের কঠিন গণ্ডী রচনা, অন্যদিকে অধ্যাত্মবোধপ্রসূত সকল মানবের ঐক্যকে স্বীকার করা এই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। একদিকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে একপংক্তিতে পানাহার করার বিরুদ্ধে নিষেধ রহিয়াছে, অন্যদিকে প্রাচীনকাল হইতে বাণী আসিতেছে:—আপনার আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে যিনি উপলব্ধি করেন তাঁহারি উপলব্ধি সত্য। আর সেইজন্য আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই যে মানুষের মধ্যে এই অধ্যাত্মবোধের প্রেরণাই পরিণামে জয়লাভ করিবে এবং সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে তাহা এমন করিয়া গড়িবে যাহাতে তাহারা তাহার অভিপ্রায়কে ব্যর্থ না করিয়া অগ্রসর করিয়াই দিবে।

কোন সমস্যা জীবন্ত না হইলে মানুষের মন যে তাহার মীমাংসার জন্য উদ্যত হয় না। কেবল তাহাই দেখাইবার জন্য ভারতের ইতিহাসের এই দৃষ্টান্তটি আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করিলাম। বর্ত্তমান যুগে এ সমস্যা যে বাস্তবিকই জীবন্ত সমস্যা। যে সকল জাতি ভৌগোলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ে অধিক ব্যবধানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র তাহারা আজ পরস্পরের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক মানুষের কাছে সমগ্র মানবজগৎ এত বৃহৎ ও প্রসারিত হইয়াছে যাহা পূর্ব্বকালে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু আমরা যে এই পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত নহি তাহা প্রতিদিনই বেদনার সহিত সুস্পষ্ট অনুভূত হইতেছে। জাতিবিদ্বেষ অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিগণ অন্য সকল জাতির বিরুদ্ধে একটা উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যপরায়ণতা জাগাইয়া তুলিতেছে। শারীরিক শক্তির ভয় দেখাইয়া দুর্ব্বল জাতিদিগকে শোষণ করিবার অধিকার নিজেদের জন্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া তাহারা নিজ নিজ দেশে দুর্ব্বল জাতিদিগের প্রবেশ-দ্বার অতিশয় বর্ব্বর ও রূঢ় ভাবে রুদ্ধ করিয়া দিতেছে। দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি মনুষ্যত্বের উচ্চগুণ প্রকাশ্যে অবজ্ঞাত হইতেছে এবং বিশ্বযশস্বী কবিগণ মহোল্লাসে পাশব বলের জয়কীর্ত্তন করিতেছেন। বহুযুগের জড়তার পর গা ঝাড়া দিয়া যে সকল জাতি জাগিয়া উঠিতেছে ও বৃহত্তর জীবনলাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান্ জাতি সকল পিছাইয়া রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এবং তাহাদের এই নূতন অবস্থায় বিশৃঙ্খলাকে নিজেদের সুযোগলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তুলিবার অপেক্ষায় আছে। যাহারা সর্ব্ববিধ দুর্গতিতে নীচে পড়িয়া আছে, তাহাদের প্রতি দয়া ও বিচারের অভাব এবং অমানুষিক অত্যাচার শক্তি-মদগর্ব্বিত ও বর্ণগরিমায় স্ফীত শ্রেষ্ঠ ও সভ্যজাতিদিগের মধ্যে কিছুমাত্র বিরল নহে।

কিন্তু এ সকল বিপরীত ব্যাপার ঘটিতে দেখিলেও, আমি এ কথা জোরের সঙ্গেই বলিব যে বাধা ও বিপদ যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহার মোচনের উপায়ও তখনই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও সুনিশ্চিত হয়। আজ যে সুসভ্য মানুষের সম্মুখে এই জাতি-সংঘাতের সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে আমাদের আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবার কথা। বিশ্বমানবের চেতনার মধ্যে মানুষ যে নব জন্মলাভ করিয়াছে, ইহাই এ যুগের সকলের চেয়ে গর্ব্ব করিবার বিষয়। সূতিকাগৃহে তাহার শয্যার আয়োজন কোথায়—সে যে দারিদ্র্যের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—তাহার শৈশব যে এখন পথের ধারের ভগ্ন কুটীরের মধ্যে ধনসম্পদের দ্বারা অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইয়া অবহেলায় কাটিতেছে। কিন্তু তাহারি বিজয়ের দিন আর দূরে নাই। সেই মহা জয়বার্ত্তা ঘোষণা করিবার কবি ও ঋষি ও বহু অখ্যাত বিনম্র কর্ম্মীদলের জন্য সে অপেক্ষা করিয়া আছে—তাহাদের আসিতেও আর বিলম্ব নাই। মনুষ্যত্বের মহা আহ্বান যখন সমুচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত তখন মনুষ্যের উচ্চতর প্রকৃতি কি তাহাতে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে। জানি, শক্তি ও জাতীয় গর্ব্বের মদোন্মত্ত উন্মাদনার উৎসবনিশীথে মানুষ সেই আহ্বানকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, তাহাকে শূন্য ভাবুকতা ও দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া ঠেলিয়া দিতে পারে—কিন্তু সেই মত্ততার মধ্যেই—তাহার সমস্ত প্রকৃতি যখন প্রতিকূল তাহার প্রবল আক্রমণ যখন ন্যায়ঘাতী ও বিচারমূঢ় সেই সময়েই—এই কথাই তাহার মানসপটে সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে যে নিজের অন্তর্নিহিত সর্ব্বোচ্চ সত্যকে আঘাত করা আত্মঘাতের চরমতম রূপ। যখন বৃহবদ্ধ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যপরতা, পরজাতিবিদ্বেষ এবং বাণিজ্যের স্বার্থান্বেষণ অত্যন্ত অনাবৃত ভাবে তাহার বীভৎসতম রূপ প্রকাশ করে, তখনি মানুষের জানিবার সময় উপস্থিত হয় যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাপকতর বাণিজ্যের আয়োজনে, কিম্বা সমাজের কোন যন্ত্রবদ্ধ নূতন ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তি নাই। জীবনের গভীরতর রূপান্তর সাধনে, চৈতন্যকে সর্ব্ববাধা বিহীন প্রেমের মধ্যে মুক্তিদানে এবং নরের মধ্যে নারায়ণের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতেই মানুষের যথার্থ মুক্তি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ভক্তবাণী।

(Book of Psalms এর অনুবাদ)

(১)

এ জীবনে সেই মানবই সুখী, যে কখনো পার্থিবতার প্ররোচনায় অভিভূত নয়, পাপের পথ যে অনুসরণ করে নাই—বিদ্রূপকারীর আসন যাহার আকাঙ্ক্ষিত নয়।

প্রভুর বিধানে তাহার আনন্দ, সেই আদেশের ধ্যানেই হৃদয়ের পরিতৃপ্তি।

নদীতীরবর্ত্তী তরুর ন্যায় তাহার শাখাসমূহ পর্য্যন্ত ফলভারে চিরদিন মহিমান্বিত, পুষ্পলাবণ্যে মনোহর, প্রচুর পল্লবপুঞ্জে নিত্য অভিনব শ্যামল; কঙ্কাল-নীরসতা কখনো তাহাকে আক্রমণ করিবে না।

ঈশ্বর-বিরাগী কখনো এ সৌভাগ্যের অধিকারী নয়, ধান্য-বিযুক্ত তুষের ন্যায় কোথাও তাহাদের প্রতিষ্ঠা নাই।

এই কারণেই ভক্তিবিহীনের বিচারধর্ম্মের যোগ্যতা নাই, পাপ-অনুবিদ্ধ ব্যক্তির সাধুসমাগমের সাহস হয় না।

অন্তর্যামী প্রভু ন্যায়বানের মর্ম্মকথার মর্ম্মগ্রাহী। পাপের পথ চিরদিনই ধ্বংস-মুখী।

(২)

অলীকের উপাসক কেন প্রচণ্ড বিরোধ পোষণ করে? জন-সাধারণ কেন মিথ্যা মোহান্ধকারে বিলুপ্ত?

পৃথিবীর রাজন্যবর্গ সজ্ঘ স্থাপন করিয়া, ধর্ম্মমুকুট-ধারীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে; তাহারা বলে—আইস আমরা সাধু বিষয়-বিরাগীদিগের শাসন করি, তাহাদিগের মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিই।

তাহাদিগের পরাভব দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাহাদিগের স্বর্গবিহারী প্রভু লজ্জা বোধ করিবেন, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন।

দুর্ব্বাক্যে তাহাদের দমন, দুঃখে তাহাদিগকে পীড়ন করিবেন।

হায় এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? আমি আমার ভুবনেশ্বর রাজাধিরাজকে হিমাদ্রির উচ্চতম শিখরে স্থাপনা করিয়াছি।

প্রভুর আদেশ আমি প্রচার করিব, তিনি যে আমাকে অভিষেক-গৌরব প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, বৎস তুমি আমার সন্তান; আমার মহিমার উত্তরাধিকারী! কে তোমার শত্রু? বিশ্বসংসার আমি তোমার পদানত করিয়া দিব, সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়াও তোমার সাম্রাজ্য প্রসারিত থাকিবে। গর্ব্বিতের বিরুদ্ধাচরণ লৌহদণ্ড শাসনে অবনত হইবে—মৃণ্ময় পাত্রের ন্যায় তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

হে বিষয়মুগ্ধ, ধর্ম্মভ্রষ্ট সকল সাবধান; দরিদ্র-পীড়ক ধনীগণ সাধুবুদ্ধি অর্জ্জন কর।

শঙ্কিত অন্তরে প্রভুর সেবা কর, আপন অক্ষমতা বিস্মৃত হইও না, নম্র-হৃদয়ে অর্ঘ্য উৎসর্গ করিও।

সাষ্টাঙ্গ নমস্কার জ্ঞাপন কর; প্রভুকে বিরূপ হইতে দিও না; তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি হইতে আপনাকে সতত রক্ষা করিও। নিঃসংশয় চিত্তে ভক্তির আনন্দ, প্রেমের উৎসব উপভোগ কর।

(৩)

প্রভু, আমার শত্রুরা আমাকে যে উৎখাত করিয়া তুলিল, তাহাদের উপদ্রবের অন্ত নাই, তাহারা যে বলে আমার আর নিস্তার নাই; দয়াময় প্রভু তুমিও তবে কি আমায় বিস্মৃত হইলে?

হে আমার চিরন্তন ধর্ম্ম আমার রক্ষাকবচ, তোমার আবরণে আমায় বিপত্তিবিহীন কর, আমার মস্তক উন্নত হউক, তোমার মহিমায় গৌরবান্বিত দীপ্তিমান কর।

সপ্তলোকপ্রান্তবাসী, বৈকুণ্ঠবিহারী আমার আর্ত্ত আহ্বান শুনিয়াছেন, আমি আজ ধন্য।

শ্রান্ত হৃদয় নিদ্রার আরাম সম্ভোগ করিয়া আজ জাগ্রত; প্রভু আজ আমায় অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন।

অক্ষৌহিনী শত্রুগণও আর আমায় ভীত করিতে পারিবে না—আমি আজ অমর শক্তি অর্জ্জন করিয়াছি।

প্রভু তুমি তবে সেনানায়ক হও, বৈরী বিধ্বস্ত হউক, তাহাদিগকে ভূলুণ্ঠিত, কৃপাভিখারী করিয়া দাও।

প্রভু, বন্দী-দাসের মুক্তিদাতা একমাত্র তুমি, তোমার সুমঙ্গল আশীষ বর্ষণে বসুধা অভিষিঞ্চিত হউক।

(৪)

আমার বন্দনা অনুমোদন কর হে আমার রাজেন্দ্র, হে আমার ন্যায়বান, দুঃখের দিনের অন্ধকার তুমিই বিদূরিত করিয়াছ, আমার অন্তরের কথা শ্রবণ কর, আমার প্রতি চিরদিন কৃপাপরবশ থাকিও।

আর কত দিন হে মানবসন্তান সকল, আমার যশো-দীপ্তি ম্লান করিতে থাকিবে—আর কত দিন গর্ব্বে অভিভূত থাকিয়া মোহের প্রতিষ্ঠা করিবে?

ভাল জানিও; সতের বিনাশ নাই, তাহারা প্রভুর বিশেষ সম্পত্তি, কাতর হইয়া যখনি আহ্বান করিব তিনি তখন বধির থাকিবেন না।

বিস্ময়স্তম্ভিত নির্ব্বাক হৃদয়ে স্থির হইয়া থাক, পাপের প্রলোভনে পরাভূত হইও না। আত্মজ্ঞান অর্জ্জন কর, অন্ধকারে একক শয্যায় সেই হৃদয়বল্লভকে কেবলি ধ্যান কর।

তাঁহারি চরণে আত্মবলিদান হউক—জীবন নিবেদন করিয়া দাও—তাঁহাতেই একান্ত নির্ভর স্থাপন কর।